সেপ্টেম্বর ২০১৬ ▪ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৩

সচিত্র বাংলাদেশ

অপার সম্ভাবনায় বাংলাদেশ পর্যটন

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা

সচিত্র বাংলাদেশ

পড়ুন ও লেখা পাঠান

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠাতে হবে
email : dfpsb@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন।
- বছরের যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া চলে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি. যোগে পাঠানো হয়, এ জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% টাকা হারে দেওয়া হয়।
- এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর ২০১৬ ▫ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৩

ï f Rb¥`b

সম্পাদকীয়

উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্যের পর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্ট করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করেই তিনি একটি উন্নত ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ছেন। যোগাযোগ, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, দারিদ্র্যের হার ২৪.৪ শতাংশে কমিয়ে আনা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর এক শুভলগ্নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন্মগ্রহণ করেন। দেশ ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সময় নানা পদক ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবং দেশ ও জাতিকে করেছেন গৌরবান্বিত। জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনার শান্তির মডেল গ্রহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৭০তম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে তাঁর প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সাক্ষরতা। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে। এখন শতভাগ শিশু বিদ্যালয়মুখী। 'শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার' বিবেচনায় নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। পর্যায়ক্রমে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সাক্ষরতা ও শিক্ষা নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ। রয়েছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা অধিকার বিষয়ক প্রবন্ধ।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। আর এ নিয়ে রয়েছে 'সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প'। সেই সঙ্গে রয়েছে শরৎ নিয়ে 'শরতে বাংলাদেশ' বিষয়ক নিবন্ধ। সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সাফল্য ও অর্জন নিয়ে সাজানো হয়েছে নিয়মিত বিভাগ।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যাটি আশা করি পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান

সিনিয়র সম্পাদক
শিবপদ মণ্ডল

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম

শিল্প নির্দেশক
মোস্তফা কামাল ভূইয়া

সহকারী শিল্প নির্দেশক
গনেশ চন্দ্র দেবনাথ

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

কপি রাইটার
মিতা খান

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন
সুবর্ণা শীল
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৯৩৩৩১২০, ৯৩৩৩১৪৯ (সম্পাদক)
E-mail : dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : পঁচিশ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনার সত্তরতম জন্মদিনে শারদীয় পুষ্পার্ঘ্য ৪
খালেক বিন জয়েনউদদীন

বিশ্বনন্দিত মনীষার গৌরবান্বিত সাফল্যগাথা ৭
শাফিকুর রাহী

আঙ্কটাডের চতুর্দশ সম্মেলন ও বাংলাদেশের অর্জন ১৩
মোঃ শামীম আহসান

স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু বদলে যাবে বাংলাদেশ ১৬
আবু নাসের টিপু

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প ১৯
মিজানুর রহমান মিথুন

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বাংলাদেশে শিক্ষার অগ্রগতি ২৫
শামসুজ্জামান শামস

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস : আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার ২৮
মাহবুব রেজা

শরতে বাংলাদেশ ৩১
দুর্জয়

গ্রিন ব্যাংকিং : পরিবেশ রক্ষায় বাগান ৩৩
সুফিয়া বেগম

তাঁর জীবন জুড়ে কবিতার মায়া ৩৪
সাইয়েদা ফাতিমা

কবিতাগুচ্ছ ৩৫-৩৭
শাহরিয়ার নূরী, নাহার আহমেদ, মাসুদুর রহমান, জাকির হোসেন চৌধুরী, আমিরুল হক, লিলি হক, আহসানুল হক, গোলাম নবী পান্না, শাহজাদী আঞ্জুমান আরা, রুহুল গনি জ্যোতি, কামাল হোসাইন

ধারাবাহিক উপন্যাস

ভ্রষ্ট বিলাস ৩৮-৪৩
সাগরিকা নাসরিন

গল্প

নিষ্পত্র ৪৪-৪৬
ফারিহা রেজা

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৭
প্রধানমন্ত্রী ৪৭
তথ্যমন্ত্রী ৪৯
আমাদের স্বাধীনতা ৪৯
জাতীয় ঘটনা ৫০
উন্নয়ন ৫২
নারী ৫৩
শিক্ষা ৫৪
প্রতিবন্ধী ৫৫
জেন্ডার ৫৬
স্বাস্থ্যকথা ৫৬
সংস্কৃতি ৫৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৮
কৃষি ৫৯
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬০
যোগাযোগ ৬০
ইতিহাস ও ঐতিহ্য ৬১
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬১
চলচ্চিত্র ৬২
আন্তর্জাতিক ৬৩
ক্রীড়া ৬৪

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা
সত্তরতম জন্মদিনে শারদীয় পুষ্পার্ঘ্য

আমরা তাঁকে নানা অভিধায় বিভূষিত করি। কিন্তু তাতে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে না। কেউ বলেন, আলোর সহযাত্রী– অনড়, অটল এক সাহসী নারী। কেউ বলেন, বিচক্ষণ রাজনীতিক ও সফল রাষ্ট্রনায়ক। আবার কেউ বলেন, মানবদরদি প্রিয়জন, সুলেখক-সংস্কৃতিমনা, বিপন্ন বাংলাদেশের দিশারি। আমরা বলি, বাঙালির প্রাণের মানুষ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন-কন্যা ও যোগ্য উত্তরসূরি।
দেখুন, পৃষ্ঠা-৪

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, লালন ও বিকাশই হয় না, বরং তা জাতিগত সৌহার্দ্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতি, মানবিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে এ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনা করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বহুজাতিক সংস্থা আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে ভূমিকা রাখছে।
দেখুন, পৃষ্ঠা-১৯

স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু বদলে যাবে বাংলাদেশ

দায়িত্ব গ্রহণের পর সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ইতোমধ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষে প্রকল্পটি রয়েছে বাস্তবায়ন পর্যায়ে। এর আগে গত ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাজিরা এবং মাওয়া প্রান্তে প্রকল্পের নদীশাসন কাজ এবং মূল সেতুর নির্মাণ কাজের সূচনা করেন।
দেখুন, পৃষ্ঠা-১৬

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: dfpsb@yahoo.com

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩১৭৩৮৪

বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা সত্তরতম জন্মদিনে শারদীয় পুষ্পার্ঘ্য

খালেক বিন জয়েনউদদীন

আমরা তাঁকে নানা অভিধায় বিভূষিত করি। কিন্তু তাতে তাঁর প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে না। কেউ বলেন, আলোর সহযাত্রী– অনড়, অটল এক সাহসী নারী। কেউ বলেন, বিচক্ষণ রাজনীতিক ও সফল রাষ্ট্রনায়ক। আবার কেউ বলেন, মানবদরদি প্রিয়জন, সুলেখক-সংস্কৃতিমনা, বিপন্ন বাংলাদেশের দিশারি। আমরা বলি, বাঙালির প্রাণের মানুষ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন-কন্যা ও যোগ্য উত্তরসূরি। পঁচাত্তরে আমরা যা হারিয়েছিলাম, তা তিনি পুনরুদ্ধারে একুশটি বছর সেই একাত্তরের পুরনো শত্রুদের সাথে লড়াই করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি জনগণ ছিল তাঁর সহযাত্রী। পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই– সে এক প্রাণসংহারের কাল। সেই দুঃসময়ে তাঁকে কতবার হনন করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে– কিন্তু বিধাতা সহায় আর বাংলার জনগণের অশ্রুমিশ্রিত আশীষে শেখ হাসিনা বেঁচে আছেন। সত্তরতম জন্মদিন তাই আমাদের কাছে গৌরব ও আনন্দের। সত্তরটি রক্তপদ্ম তাঁর মায়াবী হস্তে অর্পণ করতেই হবে। সেই একাশিতে তিনি প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এক সাগর বেদনা বুকে বয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের প্রাপ্য তিনি মিটিয়েছেন, আমরা তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য রেখেই চলেছি। কিন্তু ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার ডালি পরিপূর্ণ। সন্তান কি কখনো জন্মদাত্রীর ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখে? মায়ের মতো তাঁর আঁচলের ছায়ায় বাংলাদেশে স্বাধীনতাকামী জনগণ। কিন্তু শত্রু ও নরপশুদেরও অভাব নেই। মানবতাবিরোধী এই চক্রটি শান্তি বিনষ্ট করে। উন্নয়নের কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করতে অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু শেখ হাসিনার কর্ম-প্রচেষ্টা থেমে নেই। তাঁর আছে সৎ সাহস, বিশ্বাস ও বঙ্গবন্ধুপ্রিয় বিপুল জনগোষ্ঠী।

বঙ্গবন্ধুর আজীবন সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এজন্য তাঁর সুদীর্ঘকাল কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সাতচল্লিশের তথাকথিত স্বাধীনতার পর থেকেই তাঁর জীবনসংগ্রাম তথা স্বাধিকার অর্জনের লড়াই শুরু। আটচল্লিশ, বায়ান্ন, ছিষট্টি, উনসত্তর, সত্তর ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের তিনিই মহানায়ক। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বাঙালির আলাদা ভূ-ভূমির। ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে তা প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ভূ-ভূমি বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু স্বাধীনতার শত্রুরা তাঁকে এবং তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের বাঁচতে দিল না। তারা অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসালো এক মার্কিনী চরকে। আর বঙ্গবন্ধুর সেই খুনিদের প্রত্যক্ষ সহায়তা করল মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী জিয়াউর রহমান। এসময় জেলখানায় হত্যা করা হলো মুক্তিযুদ্ধের মূল সংগঠক চার জাতীয় নেতাকে, যাঁরা বঙ্গবন্ধুর আজীবন

সহচর ছিলেন। এক পর্যায়ে সেই মার্কিনী চর মোশতাক-সায়েম ক্ষমতা থেকে অপসারিত হলো। সামরিক ফরমান জারি করে জিয়া একচ্ছত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করল। নির্যাতন-নিপীড়ন চলল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের লোকদের ওপর। হত্যা-ক্যু ছিল জিয়াউর রহমানের একমাত্র কাজ। শুধু তাই নয়, হ্যাঁ-না ভোটে অবৈধ প্রেসিডেন্ট হয়ে এই লোকটি রক্তে ধোয়া সংবিধানকে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিল। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার করা যাবে না– এমন ধারাও সংবিধানে প্রতিস্থাপন করা হলো। সাথে সাথে সংবিধানের মূল চারটি স্তম্ভকে অবলুপ্ত করা হলো। স্বাধীনতাবিরোধীদের নাগরিক ও রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া হলো, আর বাতিল করা হলো দালাল আইন। এভাবেই শুধু জাতীয় সংগীত ও মানচিত্র ধারণ করে টিকে থাকল বাংলাদেশ নামক দেশটি। যার অপর নাম ছিল মিনি পাকিস্তান। এভাবেই ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চলেছে বাংলাদেশের রাজনীতি ও জনগণের অধিকারহারা জীবনযাত্রা।

কিন্তু কালপরিক্রমা কখনো অপকর্মের বোঝা বহন করে না এবং ইতিহাসও কাউকে ক্ষমা করে না। আর বিচারের বাণীও নিভৃতে কাঁদে না। যারা সত্যকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল, হাজারো ষড়যন্ত্র করেছিল, বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নকে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, তারা আজ নিশ্চিহ্ন। অবশ্য এজন্য বঙ্গবন্ধুর ন্যায় তাঁরই উত্তরসূরিকে একুশটি বছর এক হাতে রুহু রেখে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ছিয়ানব্বই সালে সেই ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে শেখ হাসিনা প্রথম সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন এবং ভাত ও ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেন। প্রথম মেয়াদে তাঁর সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল :

- ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা নদীর পানি চুক্তি
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি
- যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ
- খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

এছাড়া, তিনি কৃষকদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ভূমিহীন, দুস্থ মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি চালু করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- বয়স্ক ভাতা
- দুস্থ মহিলা ও বিধবা ভাতা
- প্রতিবন্ধী ভাতা
- মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
- কম্যুনিটি ক্লিনিক
- আশ্রয়হীনদের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প
- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
- বিনা জামানতে বর্গাচাষিদের ঋণ প্রদান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় মেয়াদে অর্থাৎ ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো :

- বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩,২৬০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ
- গড়ে ৬.২ শতাংশের বেশি জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন
- ৫ কোটি মানুষকে মধ্যবিত্তে উন্নীতকরণ
- ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমানা নিয়ে বিরোধের নিষ্পত্তি
- প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন
- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ
- কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ড এবং ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা
- চিকিৎসা সেবার জন্য সারা দেশে প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন
- দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের ৩৮.৪ থেকে ২০১৩-২০১৪ সালে ২৪.৩ শতাংশে কমিয়ে আনা
- জাতিসংঘ কর্তৃক শেখ হাসিনার 'শান্তির মডেল' গ্রহণ ইত্যাদি।

শেখ হাসিনার বর্তমান জোট সরকার ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়। এ পর্যন্ত তাঁর সরকারের সাফল্যগুলো আমাদের দৃষ্টি কেড়েছে, আর তাহলো–

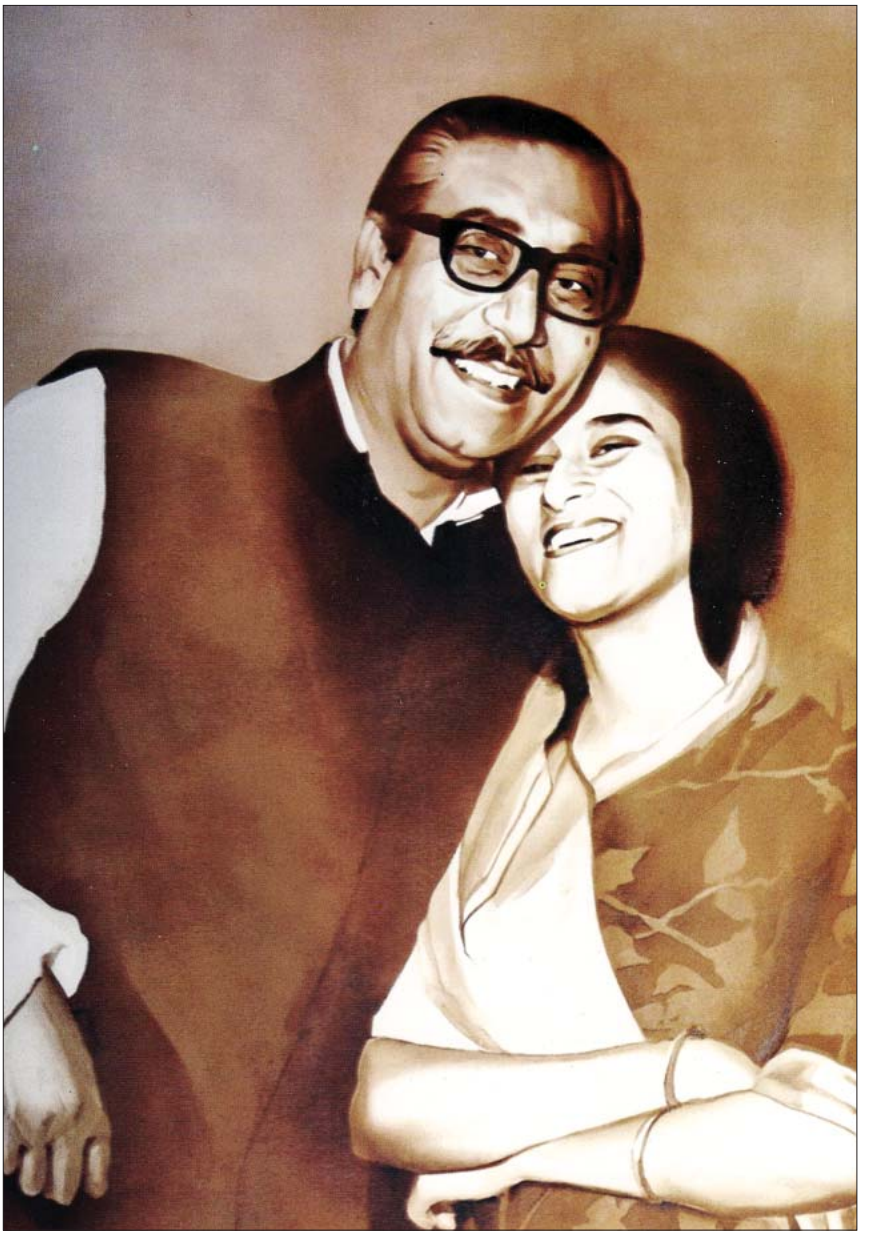

স্নেহময় পিতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

- বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ
- ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক স্থলসীমানা চুক্তির অনুমোদন এবং দুই দেশ কর্তৃক অনুসমর্থন (এর ফলে দুই দেশের মধ্যে ৬৮ বছরের সীমানা বিরোধের অবসান হয়েছে এবং অর্ধ লক্ষাধিক মানুষ বাংলাদেশের বৈধ নাগরিকত্ব পেয়েছেন)
- মাথাপিছু আয় ১,৩১৪ ডলারে উন্নীতকরণ
- দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে হ্রাস
- ২৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ
- পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু
- মেট্রোরেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ শুরু
- বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৪,০৭৭ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণকাজ শুরু
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান
- শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন।

এছাড়া বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার, একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, সমুদ্র বিজয়, ছিটমহল বিনিময়, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম, জঙ্গিবাদ নিপাত, একুশে আগস্ট গ্রেনেড ছুড়ে মানুষ হত্যার বিচার বিশ্বে কূটনৈতিক সাফল্য–তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাঁর দূরদর্শী চিন্তা-চেতনা গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় চিহ্নিত হয়ে আছে। শেখ হাসিনা বাঙালি জনগোষ্ঠীর একমাত্র ভরসাস্থল ও কাণ্ডারি। বিপন্ন বাংলাদেশে তিনি ন্যায়-আদর্শ, গণতন্ত্র ও মানবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছিলেন গৃহবধূ, এখন বাংলাদেশের দিশারি। তাঁর গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তাঁর জন্মদিন উৎসবে পরিণত হওয়া উচিত।

শেখ হাসিনা ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাটে নিজ গ্রামে। ঢাকা এসে সেকালের নারী শিক্ষা মন্দির, আজিমপুর গার্লস স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৬৮ সালে পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম. এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। পঁচাত্তরে তিনি এবং তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানা ওয়াজেদ মিয়ার সাথে জার্মানিতে ছিলেন। এসময় পুত্র-কন্যা জয় ও পুতুল তাঁদের সাথে ছিল। তিনি লাভ করেছেন দেশি-বিদেশি ডিগ্রি ও সম্মাননা। শেখ হাসিনা আটপৌরে একজন বাঙালি নারী। বেশভূষায় তিনি সাধারণ। বিলাসিতা তাঁর অপছন্দ। তিনি ধর্মপ্রাণ এবং অন্য ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল। তিনি একজন শাশ্বত বাঙালি নারীর চিরন্তন রূপ। তাঁকে ঘিরেই বাঙালির সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা। সত্তরতম জন্মদিনে তাঁকে আমরা শারদীয় পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছি এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির এই বাংলায় আমাদের সকল শ্রদ্ধা উৎসর্গ করছি।

তথ্যসূত্র : ছোটোদের শেখ হাসিনা–নজরুল ইসলাম, জিনিয়াস পাবলিকেশন, ঢাকা।

লেখক : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

প্রবন্ধ

বিশ্বনন্দিত মনীষার গৌরবান্বিত সাফল্যগাথা

শাফিকুর রাহী

বর্তমান বিশ্বে সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানদের শ্রেষ্ঠতম সম্মানজনক স্থান অর্জনকারী বিশ্বনেতা রাষ্ট্রনায়ক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা। বর্তমান বিশ্বে তাঁর মতো অমন দূরদর্শী, দুঃসাহসী, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানবিক নেতা সত্যিকার অর্থেই বিরল। সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা আর প্রজ্ঞায় যে মহীয়সী মনীষা আশাহত জাতির মনোমাঠে বপন করেন বাঙালির হারানো অধিকার প্রতিষ্ঠার সাহস। তিনি বাঙালি জাতির ভয়ংকর কালবেলায় অতি দৃঢ়তার সাথে দুর্দান্ত মনোবলে সাম্য-সম্প্রীতি আর মুক্তির লড়াইয়ে বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও অঙ্গীকার ঘোষণা করেন ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অভিযানে। দেশে দেশে যুগে যুগে অনেক জ্ঞানীগুণী বিদগ্ধপ্রাণ মানুষ পরম দেশপ্রেমী নেতার জন্মের মাধ্যমে বিশ্ব মানবসভ্যতা হয়েছে বিকশিত, আরো আলোকোজ্জ্বল। বর্তমান বিশ্বে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হচ্ছে মানবতা, ধ্বংস আর প্রাণঘাতী আঘাতের মারণত্রাসে বিপন্ন হচ্ছে বিশ্ব লোকালয়। এ দানবীয় আগ্রাসন ও অরাজকতা চলতে দেওয়া যায় না। এসব অন্যায়, অবিচার, মানুষ হত্যা আর ধ্বংসাত্মক অপকর্মের বিরুদ্ধে বাঙালির প্রাণের নেত্রী শেখ হাসিনা সবসময় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। বিশ্বমানবতার কল্যাণে তিনি নিজেকে করেছেন উৎসর্গ।

তিনি প্রিয় স্বজন হারানোর দীর্ঘ শোক-দুঃখের আঁধার সড়ক ভেঙে সমগ্র দেশবাসীকে জানান দিলেন শোককে শক্তিতে পরিণত করে ন্যায়নীতি আর সত্য প্রতিষ্ঠার অহিংস আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণের। তাবৎ বিশ্বজুড়ে দুটি বিষয়কে নিয়ে তুমুল হানাহানি, রক্তপাত আর প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হতে হয়। ধনী-গরিব কিংবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের মাঝেও এমনটা চলে আসছে আদিকাল থেকে। একটি সত্য আর মিথ্যার লড়াই, অন্যটি শুভ আর অশুভের। সভ্যতার শিকড় থেকেই এ নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ চলে আসছে নানা কায়দায়। বর্তমান পরিবর্তন পরিবর্ধনশীল আধুনিক সভ্য দুনিয়াতেও এর অদলবদল হয়নি। কিছু যন্ত্রপাতি আর অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের ফলে তার নিয়মকানুন খানিকটা পালটিয়েছে মাত্র। ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইতিহাস সাক্ষী দেয় অশুভ দানবীয় অপশক্তি পরাজিত হয় শুভবাদের মানবিক মহান আদর্শের কাছে। সত্যের জয় অনিবার্য–এটাও পৃথিবীর শুরু থেকে লক্ষ করা যায়। আমাদের প্রিয় নেত্রীও মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের জয়গান গাইতে গিয়ে বহুবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন প্রবল প্রতাপের সাথে। অশুভের বিরুদ্ধে শুভবাদের নিশান হাতে লড়তে গিয়েও বার বার রক্তাক্ত হয়েছে পবিত্র জমিন। তিনি তাতেও কখনো থেমে থাকেননি, তাঁকে কোনো ষড়যন্ত্রকারী অপশক্তি দমাতে পারেনি। তিনি পথ চলেন আপন টানে, আপন আলোয় সত্য ও সুন্দরের দারুণ প্রত্যাশায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার সাহসী সংগ্রামে। ইতিহাস বিকৃতকারীদের সমস্ত চক্রান্তকে ঘৃণাভরে ছুড়ে ফেলে তিনি বাঙালির অমর সংগীতের সুর-মূর্ছনায় নিজেকে খোঁজেন পরম মমতায় ভালোবাসার সুনিবিড় আলো-আঁধারের মাঝে ধ্যানরত তপস্যায় তছবি হাতে।

আজও যেভাবে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে জঙ্গি সন্ত্রাসীরা রক্তাক্ত করে চলেছে মানুষের মানচিত্র তা কি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায়? ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিনসহ আরো অনেক রাষ্ট্রের গৃহহারা লাখো লাখো শরণার্থী অসহায় নারী-শিশুর কান্নায় সমুদ্রের ঊর্মিমালা যেন থমকে দাঁড়ায়। বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। এ ধ্বংসলীলার ভয়ংকরী থাবা থেকে নিরস্ত্র নিরীহপ্রাণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য সকল সচেতন বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আর বন্ধ করতে হবে অস্ত্র বেচাকেনার হাটবাজার। মানবসৃষ্ট পরিবেশ প্রতিকূলতা আর প্রাকৃতিক বায়ুদূষণের ফলে গণমানুষের জীবন আজ ভয়াবহ হুমকির মুখে। জলবায়ু দূষণের ভয়ংকর থাবা থেকে মানুষের পরিত্রাণের যে বিপ্লবী আহ্বান জানিয়েছিলেন বিশ্বের সকল মানুষের জনদরদি নেতা দেশরত্ন শেখ হাসিনা ২০১২ সালে জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করে, তা বিশ্বনেতাদের বিস্মিত করেছিল। দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব মানবসভ্যতা মহাবিপদের সম্মুখীন। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, আইলা-সিডরের প্রাণঘাতী ধ্বংস- তাণ্ডব মোকাবিলায় বাংলাদেশ অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার যুগোপযোগী বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয়ার্ত আক্রমণ থেকে মানবসম্পদ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের

লক্ষ্যে তিনি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাতে বিশ্বের প্রায় সব দেশের নেতাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন। এ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গণমানুষের পরম আপনজন শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পরিবেশ পদক 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর আগেও তিনি বিভিন্ন সময় নানামুখী মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় অনেক মূল্যবান পুরস্কার পেয়েছেন।

আজকে সারা দুনিয়া জুড়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা যে সফল রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার প্রধানের শ্রেষ্ঠত্বের সুনাম অর্জন করছেন তা কেবল বাংলাদেশের মানুষের গর্ব নয়, তা এখন বিশ্বগর্বে পরিণত হয়েছে। আজ বিশ্বের দেশে দেশে জঙ্গি সন্ত্রাসী অপতৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রক্তাক্ত হচ্ছে বিশ্ব মানবসভ্যতার ভৌগোলিক ভুবন। এ সভ্যতা বিনষ্টকারী জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে কোনো বিবেকবান মানবসন্তান নীরব থাকতে পারে না। এই ভয়ংকর অধঃপতনের হিংস্র থাবা থেকে জনমানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দেশরত্ন শেখ হাসিনা দীর্ঘকাল ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এ দুঃসাহসী কর্মপরিচালনা করতে গিয়ে তিনি বার বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। তবুও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন–সুন্দর আলোকিত পৃথিবী গড়তে চাই কিন্তু এর আগে চাই অশুভ জঙ্গিবাদের বিনাশ। তাঁর এই দুঃসহ সংগ্রামী পথচলায় গণমানুষের সম্পৃক্ততা ছিল বলেই হয়ত তিনি আজ অমন বিশ্বকাঁপানো সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন। তিনি স্বকণ্ঠে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে বলেছেন, 'প্রয়োজনে জাতির পিতার মতো জীবন দেব, তবু আমি কোনো অন্যায়ের কাছে মাতা নত করব না কখনো'।

বর্তমান বিশ্বনেতাদের মধ্যে তিনিই কেবল বার বার এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন– 'জন্মিলে মরতে হয় তাই আমি কখনো মৃত্যুর পরোয়া করি না। মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাব। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনে জীবন বাজি রাখতেও আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন যে, আমার পিতা বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য, ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কী ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় বছরের পর বছর কারাগারের ভেতর দুঃসহ জীবন কাটিয়েছেন। আমিও জাতির পিতার সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছি'। এমন তেজদীপ্ত উচ্চারণ তিনিই তো কেবল করতে পারে, যার আছে মাটি-মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, মমত্ববোধ। মানবপ্রেম আর দেশপ্রেম না থাকলে কোনো নেতাই এমন দুঃসাহসী কণ্ঠে আত্মত্যাগের কথা ঘোষণা করতে পারেন না। এ দুর্ভাগা বাঙালির মানসমাঠে তিনি বপন করেছেন মানবিক মূল্যবোধের অমর বীজ। তাঁর এ মুক্তির পথচলায় সমগ্র দেশবাসী আজ গর্ববোধ করে। বাংলার গণমানুষের পরম আপনজন জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন বিশ্বগর্ব বলে প্রচারমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন হাজারো লাঞ্ছিত-বঞ্চিত-অসহায় মানুষের মলিন মুখেও ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি। আকাশে-বাতাসে বেজে ওঠে ভালোবাসার মরমী সংগীত। তিনি যে আজ বিশ্বগর্ব এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায় তার অবিস্মরণীয় অগ্র অভিযানের মানবিক কর্মকাণ্ডে অর্জিত প্রশংসিত খেতাবে।

তিনি অর্জন করেছেন এ যাবৎকালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার-সম্মাননা, ডি লিট– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব ল ডিগ্রি ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে, জাপানের ওয়াসেদা ইউনিভার্সিটি থেকে অনারারি ডক্টর অব ল ৪ জুলাই ১৯৯৭ সালে, স্কটল্যান্ডের ডান্ডির ইউনিভার্সিটি অব এবারেটে থেকে লিবারেল আর্টসে অনারারি পিএইচডি ২৫ অক্টোবর ১৯৯৭ সালে, ১৯৯৭ সালে ভারতের নেতাজী সুভাষচন্দ্র পদক, ১৯৯৭ সালে রোটারি ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পল হ্যারিস ফেলো ঘোষিত, পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘ ২৫ বছরের গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কোর ফেলিক্স হোফে- বোইনি শান্তি পদক, সর্বভারতীয় শান্তি পরিষদের মাদার তেরেসা পদক ১৯৯৮, বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র প্রসারে অবদানের জন্য নরওয়ের অসলোর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ফাউন্ডেশন কর্তৃক এম কে গান্ধী পদক ১৯৯৮, লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালের মেডেল অব ডিস্টিংশন ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৮-৯৯, হেড অব স্টেট মেডেল ১৯৯৬-৯৭, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডিগ্রি দেশিকোত্তম, (ডক্টর অব লিটারেচার) ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৯, ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এর সেরেস মেডেল ১৯৯৯, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির- ডক্টর অব ল, ২০ অক্টোবর ১৯৯৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারি ডক্টর অব ল, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৯, ২০০০ সালে আফ্রো এশিয়ান লইয়ার্স ফেডারেশনের পার্সন অব দ্য ইয়ার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেক্টিকাট অঙ্গরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ব্রিজপোর্ট থেকে অনারারি ডক্টর অব হিউম্যান লেটাস, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০০, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার র‍্যানডল্ফ ম্যাকন ওম্যান'স

কন্যা ও নারী শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তিবৃক্ষ' সম্মাননা প্রদান করেন –পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হোটেল সিপ্রিয়ানি লি স্পেসিয়ালিতায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনেপ)-এর নির্বাহী পরিচালক Achim Steiner-এর কাছ থেকে 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করেন –পিআইডি

কলেজ থেকে পার্ল এস বাক পদক, ৯ এপ্রিল ২০০০। এছাড়া আরো পেয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব লায়ন্স ক্লাবের মেডাল অব মেরিট পদক-২০০৫, ২০০৯ সালে ভারত সরকারের ইন্দিরা গান্ধী পদক, শিশুমৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘের এমডিজি পদক-২০১০, ২০১১ সালে গণতন্ত্র সুসংহতকরণে প্রচেষ্টা ও নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখার জন্য ফ্রান্সের দোফিঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক, ২০১১ সালে বিশ্ব মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদানের জন্য জাতিসংঘ ইকনোমিক কমিশন ফর আফ্রিকা, জাতিসংঘে এন্টিগুয়া-বারমুডার স্থায়ী মিশন, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন ও সাউথ-সাউথ, নিউজের সাউথ-সাউথ পদক, বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ ২০১১, ভারতের ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব লিটারেচার, জানুয়ারি ২০১২, ২০১২ সালে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে বিশেষ অবদানের জন্য ইউনেস্কোর কালচারাল ডাইভারসিটি পদক, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর পিস ট্রি পুরস্কার, জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নেতৃত্বের জন্য জাতিসংঘের চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ পুরস্কার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) আইসিটি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ লাভ করেন। আমাদের মহান নেত্রীর এই বিশ্বজনীন সম্মান অর্জনে একজন কবি হিসেবে বিষয়টি আমাকে দারুণভাবে আলোকিত ও আন্দোলিত করে। এমন অনেক পুরস্কার আছে যা পেলে একজন সৃজনশীল মানুষের কর্মস্পৃহা যেমন বেড়ে যায়, তার প্রতিভা বিকাশেও রাখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ যাবৎকালে যে সকল মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তা বিশ্বের অন্য কোনো নেতার ভাগ্যললাটে অঙ্কিত হয়েছে কি-না তা আমার জানা নেই।

১৯৯৭ সাল থেকে তিনি প্রায় প্রতিবছরই একাধিক পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন, যা সমগ্র বিশ্ববাসীর গর্বে পরিণত হয়েছে। কারণ তিনিই তো পিতা বঙ্গবন্ধুর মতো দুনিয়ার সকল মেহনতি-নির্যাতিত-নিপীড়িত গণমানুষের মহামুক্তির কথা ভাবেন, সারা বিশ্বের সকল মানুষের শান্তি-সুখের পুষ্পিত কানন প্রতিষ্ঠা তাঁর অক্লান্ত সংগ্রামের লক্ষ্য। তাঁর যাবতীয় প্রাপ্ত সম্মানজনক প্রাপ্তি তিনি সবসময় বাংলার আপামর জনগণকে উৎসর্গ করেছেন, যা সমগ্র বিশ্বে এক বিরল ইতিহাস। এসব অসামান্য অর্জন কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধুর উত্তম উত্তরাধিকার বলেই সম্ভব হয়েছে। তিনি আজও এ দেশের জন্য, দেশের ১৬ কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে রাতদিন কঠিন পরিশ্রম করে চলেছেন জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় সংকল্পে। সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের প্রাচীন প্রাচীর ভেঙে ভয়ংকর অন্ধকারে আলোর পরশে আনন্দবানে তিনি ভাসিয়েছেন হাজার হাজার ছিটমহলবাসীকে। তাঁর মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমের এমন নজির বর্তমান বিশ্বে আর কোনো নেতার আছে বলে মনে হয় না। তাঁর এ বিপ্লবী উত্থানের ইতিহাসও অনেক জটিল, কঠিন ও বন্ধুর। এই কঠিন বাধার আঁধার পথ অতিক্রম করে আলোর জগতে প্রবেশ করবে–ছিটবাসী কি তা কখনো ভেবেছিল? তাদের অন্ধকার জীবন এমন অপরিসীম আলোর ফোয়ারায় উদ্ভাসিত হবে! দীর্ঘকাল ধরে অলীক অভিশাপের অনলে জ্বলেপুড়ে ছারখার হচ্ছিল তাদের তাপিত মনোলোক। আজ তারা আলোর মিছিলে বাঁধভাঙা আনন্দে উদ্বেল। আবেগে-আনন্দ অশ্রুতে মুখরিত আজ দশদিগন্ত।

তারা এখন আলোকিত আগামীর স্বপ্ন দেখে, তাদের আগামী প্রজন্ম স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে দেশের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। দীর্ঘ জনম পর 'মুজিব-ইন্দিরা' চুক্তির সফল বাস্তবায়নের ফলে তাদের জীবনমান উন্নয়নের পথে আর কোনো বাধা থাকল না। আজ তারা সকলেই স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক। এ অসম্ভব কাজটির জন্য দেশের ভেতরের শত্রু, বাইরের শত্রুদের কত অপবাদ আর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে। যাঁর প্রবল প্রজ্ঞা আর দূরদর্শী চিন্তা-চেতনার ফলে মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে দীর্ঘকালের অমীমাংসিত ইস্যু সমুদ্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ নিউইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর সাউথ সাউথ কো-অপারেশন (IOSSC) -এর সদর দপ্তরে সাউথ সাউথ সদর দপ্তর ও সাউথ সাউথ নিউজ-এর সভাপতি অ্যাম্বাসেডর ফ্রান্সিস লরেনজো (Francis Lorenzo) -এর কাছ থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার গ্রহণ করেন –পিআইডি

সীমার সফল সমাধানের এক অপরিসীম কর্মসাধনের ভেতর দিয়ে অবর্ণনীয় সাফল্য অর্জন করে। এরফলে বাঙালি জাতির আর এক বিরল সৌভাগ্যের অমর ইতিহাস রচিত হলো। যা অন্য কোনো সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানরা চিন্তাও করেননি। আজ বিশ্বজুড়ে অতীব গর্বের সাথে উচ্চারিত একটি নাম চিরভাস্বর বিশ্বনেতা রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। আজ বীর বাঙালির মহামুক্তির শেষ ঠিকানা যেন শেখ হাসিনা। বিশ্ব জয়ের অমরকীর্তি শেখ হাসিনা, বীর বাঙালির বিস্ময়ের নাম শেখ হাসিনা।

এমনিভাবে দুনিয়া জুড়ে কালে কালে উচ্চারিত হবে দেশরত্নের অসম্ভবকে সম্ভব, মানবতার মহামুক্তির বীরত্বগাথা। বাঙালির আমূল মুক্তির লক্ষ্যে যেভাবে তিনি ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তা আজ সারা বিশ্বে বিরল। তাঁর দেশপ্রেম আর মানবতার মুক্তির সোনালি স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে–সেদিন হয়ত আর বেশি দূরে নয়। প্রতিবেশি দেশ কিংবা বিশ্বের যে-কোনো দেশের সাথে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের যে দর্শন তাঁর মননশীল চিন্তা-চেতনায় তেজদীপ্ত অধ্যায়ের শুভ সূচনা করেছে তাতে দেশ-বিদেশের সকল জ্ঞানীগুণী বিস্মিত। তারা সকলেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মহান আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান, অবলোকন করেন তাঁর দূরদৃষ্টির প্রবল প্রখরতা। কারণ একটি অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেশ বাংলাদেশে আজ উন্নয়নের যে সুবাতাস বইছে তা দেখে সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত। আজ সকলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় জয়তু শেখ হাসিনা। কারণ বর্তমান বিশ্বে দেশরত্ন শেখ হাসিনা যেভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছেন, খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলেছেন তা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশের সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কি-না জানি না।

এ সাফল্যগাথা অর্জনের পেছনে জড়িয়ে রয়েছে এদেশের অসংখ্য মেহনতি কৃষক–শ্রমিকের অমূল্য অবদান। আজ বাংলাদেশ খাদ্য রপ্তানিকারক দেশের গৌরব অর্জন করেছে, যা সম্ভব হয়েছে একমাত্র কৃষিবান্ধব শেখ হাসিনার সুদৃঢ় পদক্ষেপের কারণে। তাঁর দুঃসাহসিক মনোবল, মানুষের প্রতি বিশ্বাস, মেধা ও প্রজ্ঞার ফলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট নিদারুণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল সমগ্র জাতি। তা থেকে উত্তরণ ছিল বড়ো দুঃসাহসিক ও চ্যালেঞ্জিং। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলায় অধিকারহারা বীর বাঙালির হাল ধরেছিলেন তিনি অত্যন্ত শক্তি ও সাহসের সাথে। যা ভাষায় বর্ণনা করাও বড়ো কঠিন। যে মহান নেতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ করেছিল আত্মদান সেই মহান নেতা জাতির পিতাকে সপরিবার নির্মমভাবে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধে সে পবিত্র স্লোগান–জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ ছিল নিষিদ্ধ। যা ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের সবচেয়ে কলঙ্কিত অধ্যায়। সে ভয়াবহ দানবীয় দুঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে জীবন বাজি রেখে মাটি ও মানুষের দুশমনদের হটিয়ে দিয়ে গণমানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ যে কত বড়ো দুঃসাহসিক কাজ তা একাধিক মহাকাব্য লিখেও শেষ করা যাবে না। বাঙালি জাতির সাথে সাথে বিশ্বের সকল বিবেকবান মানবিক জ্ঞানীগুণীরাও তাঁর মূল্যায়ন করে চলেছে ঠিকই।

আজ আমরা গর্ববোধ করি, তিনি আজ বিশ্বগর্ব। তাঁর এমন বিশ্ব কাঁপানো অর্জনে শত ঝড়ঝঞ্ঝার মাঝেও শত আতঙ্কের ভেতরও অফুরান আনন্দে নেচে ওঠে মন। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতির দেশ বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটির অধিক। এমতাবস্থায় জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোনো নেতার দ্বারা অমন অনবদ্য কর্মসাধন অসম্ভব। তিনি যেভাবে জাতির জনকের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে গণমানুষের

সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন সারাক্ষণ সারাবেলা তাও আজ সমগ্র দুনিয়াতে এক বিরল নজির স্থাপন করেছে। মাটি আর মানুষের প্রতি যদি কারো পরম মমত্ববোধ না থাকে তবে সে কখনো এমন দুঃসাধ্যকে সাধন করতে পারে না। বাংলাদেশের হতদরিদ্র ক্ষুধাপীড়িত গণমানুষের মলিন মুখে হাসি ফোটানোর যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন তার সফল বাস্তবায়নও আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাঁর সাহসিকতা ও মানবিকতার ফলে সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইস্পাতকঠিন মনোবল জাতিকে দিয়েছে সকল বাধাকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস ও প্রেরণা।

তিনি যেভাবে জাতির পিতার অহিংস আন্দোলন সংগ্রামের আলোকিত পথে হাঁটছেন তা অচিরেই বিশ্বসভায় নতুন মাত্রায় বিকশিত হবে। তাঁর এত অমূল্য অবদান, এত যশ-খ্যাতির মাঝেও কেন যেন অপূর্ণতা এসে ভিড় জমায় তৃষিত তাপিত মনোলোকে। যা ভাবতে গেলে বড়ো কষ্ট হয়। বিষাদের কালো আঁধার গ্রাস করে মানবিক মনোমাঠ। নিজেকে নিজে হাজার প্রশ্ন করেও সঠিক উত্তর মেলে না। রাতজাগা দীর্ঘশ্বাসে নক্ষত্রের পতন দেখে আত্মরোদন ধ্বনিত হয় চারদিক জুড়ে। যেন কোথাও দেখতে পাই না মীমাংসার আলোকিত উজ্জ্বল ছায়াপথ, যেখানে মিলবে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর! আজকে যদি বিশ্ববিবেকের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিই তবে কি তারা সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হবে ? তারা কেউ-ই তা পারবে না বোধ হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনন্দিত নেতা দেশরত্ন শেখ হাসিনা, তাঁর দীর্ঘ মঙ্গলময় অভিযানে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দুঃসাহসিক সকল কর্মকাণ্ডে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন সে অসামান্য সাফল্যগাথার স্বীকৃতি কি তিনি পাবেন না? অনেক আগেই তিনি সে যোগ্য সম্মান পাওয়ার সময় অতিক্রম করেছেন। তাঁর বিশ্বশান্তির নানাবিধ গৌরবান্বিত কল্যাণীয় কর্মযজ্ঞের অমর ইতিহাস রচনার মাধ্যমে।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের জনদরদি নেতা শেখ হাসিনাই সমগ্র বিশ্বে এমন এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যা দুনিয়ার কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা সরকার প্রধানের পক্ষে আজো সম্ভব হয়নি। আমাদের প্রাধানমন্ত্রী ১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এক জনগুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের সোনালি স্বাক্ষর রেখেছেন। অতীব মানবিক ও দেশদরদি আত্মপ্রত্যয়ী দৃঢ়তায় সফলতার সাথে তিনি তা সমাধান করেন। যা বিশ্বজুড়ে জ্যোতির্ময় আভা ছড়িয়ে জানান দিয়েছে যে, বীর বাঙালির আত্মপরিচয় হলো তারা কোনো অন্যায়ের সাথে আপোশ করতে জানে না। তারা মানে না কোনো পরাজয়। বাঙালি জাতি কখনো কোনো নির্যাতন নিপীড়নের কাছে মাথা নত করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর রাষ্ট্রনায়ক বিশ্বনেতা শেখ হাসিনা যেভাবে তার দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নানা দুঃসাধ্যকে সাধন করেছেন। তিনিই তো পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের চির অবসান ঘটিয়ে শান্তিচুক্তির মধ্যদিয়ে পাহাড়ে যে চিরস্থায়ী শান্তি কায়েম করেছেন তা আজো বিশ্বের কোনো নেতা করতে পারেনি। তাঁর মহৎ মমত্ববোধের কারণে রক্তপাতহীন সাফল্যগাথার জন্যই তো দেশরত্ন শেখ হাসিনা নোবেল পুরস্কারটি পেতে পারতেন।

আজ সারা বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় জঙ্গি সন্ত্রাসী অপকর্মের ফলে লাখো লাখো মানুষের জীবন-জীবিকা হয়ে পড়ছে হুমকির সম্মুখীন। এমন অবস্থায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই দেশীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে জঙ্গি সন্ত্রাসী নির্মূলসহ ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় অঙ্গিকার বাস্তবায়নের পথে অভিযান অব্যাহত রেখেছেন অতীব বিচক্ষণতা ও সাহসের সাথে। এদিক বিবেচনায় সম্মানজনক নোবেল পুরস্কারটি আগামীতে দেশরত্ন শেখ হাসিনা পেতেই পারেন। তবে আশার কথা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন, নোবেল থেকেও অনেক বড়ো পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন যা হাজার নোবেলের চেয়েও অনেক উত্তম এবং গৌরবের, তা হলো বাংলার কোটি কোটি মানুষের পরম ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় তিনি আজ বিশ্বনেতা ও রাষ্ট্রনায়কের অভিধায় আলোকিত করে চলেছেন দশদিগন্ত। অর্থাৎ বাংলার গণমানুষের কাছ থেকে তিনি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করেছেন সেটি সম্ভব হয়েছে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধুর অসামান্য অবদানের ফলে। তাঁর মেধায় প্রজ্ঞায় বিশ্বনেতা হিসেবে যে খ্যাতির গোলাপ কুড়িয়েছেন তাও কি নোবেলের চেয়ে কম মূল্যের? তারপরও আমাদের প্রত্যাশা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনন্দিত জনদরদি নেতা গণমানুষের পরম আপনজন দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে নোবেল কমিটি যেন তাদের মহামূল্যবান পুরস্কারটি প্রদান করে বাঙালির আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন করে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে যেসব বিষয়ের ওপর নোবেল পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে– ১. ১৯৯৭ সালে শান্তি চুক্তি করে দীর্ঘ দু'দশকেরও অধিক সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে জানান দিয়েছিলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে কোনো সন্ত্রাসীদের স্থান নেই। তাঁর এই দূরদর্শী ও বীরত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের জন্য তখনই শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের একমাত্র যোগ্য দাবিদার হয়েছিলেন দেশরত্ন শেখ হাসিনা। কারণ বিশ্বে আর কোথাও কোনো দেশ এমন রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি আজো ২. বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশে যেখানে ক্ষুধাপীড়িত হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যে তার অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণের কারণে বাংলাদেশের মানুষ আজ ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চলেছে এ জনগুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের অকল্পনীয় ভূমিকার জন্যও নোবেল প্রাইজটি প্রাপ্য কেবলমাত্র শেখ হাসিনার। কারণ এত অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বে আর কোনো দেশ এমনিভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি ৩. বিশ্বে আজ প্রায় দেশেই জঙ্গিবাদের জঘন্য সন্ত্রাসী ধ্বংসযজ্ঞের বীভৎসতায় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে অসংখ্য অসহায় মানুষ। নারী-শিশুর আত্মহাহাকারে সেখানে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশীয় আন্তর্জাতিক গুপ্তঘাতক জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের ভয়ংকর আগ্রাসনকে অত্যন্ত সফলতার সাথে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বিধায় সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। এসব জনগুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যও শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য দাবিদার দেশরত্ন শেখ হাসিনা ৪. আমাদের স্বাধীনতার দীর্ঘ চার দশকের অধিক সময় পরও অন্য কোনো সরকারের নেতা-নেত্রী যা পারেনি শেখ হাসিনার একক সিদ্ধান্তের ফলে তা সম্ভব হয়েছে। যেমন দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছিল যে অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা বিরোধ। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সেই বিরোধ অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে বহির্বিশ্বে তুমুল প্রসংসা ও আলোচনার ঝড় বইয়ে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেছে। যা এর আগে অন্য কোনো নেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

তারপর আজ আবার হাজার হাজার ছিটমহলবাসীদের দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত ইস্যুকে সফল সমাধানের এক অসাধারণ অবদানের মধ্যদিয়ে তিনি বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের সাথে ভৌগোলিক সীমারেখার পুনঃবাস্তবায়নের ফলে দু'দেশের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য–সম্প্রীতির নতুন সেতুবন্ধে মানবিকতার শুভ যাত্রাপথ সৃষ্টি করেছেন। যা অতি বীরত্বপূর্ণ ও গর্বিত জাতি হিসেবে আজ ছিটের গণমানুষেরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ লাভ করেছে। দীর্ঘ প্রায় ৬৮ বছরের অধিকারহারা জনমানুষ আজ সকল নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। এমন আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসামান্য অবদানের জন্য বিশ্বনেতা দেশরত্ন শেখ হাসিনা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার একমাত্র

নারী ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘ সাউথ সাউথ পুরস্কারে ভূষিত করা হয় –পিআইডি

দাবিদার। এর আগে তিনি দেশ-বিদেশে যে সকল পুরস্কার পেয়েছেন মানবতার কল্যাণে নানামুখী কর্মসাধনের অমূল্য অবদানের জন্য। নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও শিশু-স্বাস্থ্যের ব্যাপক উন্নয়ন, ক্ষুধাপীড়িত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আজ তিনি শতভাগ সফল হয়েছেন–যা বিশ্বে কোনো দেশ পারেনি কেবলমাত্র বাংলাদেশ পেরেছে জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও গতিশীল নেতৃত্বের ফলে। তাঁর প্রগতিশীল বলিষ্ঠ ভূমিকা আজ বিশ্বের দেশে দেশে প্রশংসিত। তিনি যেভাবে বিশ্বমানবতার মুক্তির লড়াইয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন তা বিশ্বে আর অন্য কোনো নেতার জীবনে এমন নজির সম্ভব হয়েছে কিনা জানি না।

তাঁর সৃজন সাধনায় এ যাবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা প্রায় দুই ডজনের অধিক। যা তাঁর মননশীল চিন্তা-চেতনায় রচিত, যাতে স্থান পেয়েছে অধিকারহারা গণমানুষের কথামালা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ – স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্র, ওরা টোকাই কেন, বিপন্ন গণতন্ত্র লাঞ্ছিত মানবতা, সহে না মানবতার অবমাননা, সাদাকালো, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ- কিছু চিন্তা-ভাবনা, বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম, অপ্রকাশিত রচনা, সবুজ মাঠ পেরিয়ে ইত্যাদি। এমন অসাধারণ গ্রন্থের লেখক আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সেসব রচনায় উঠে এসেছে বীর বাঙালির স্বপ্ন ও সফলতার গর্বগাথা। বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্যের রূপলাবণ্যের শব্দসম্ভারে বিবৃত হয়েছে পঁচাত্তর পরবর্তীতে কীভাবে মানবতা ভুলুণ্ঠিত হয়েছে, কীভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের গণমানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। যেন এক মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। এসব অমার্জনীয় অপরাধ এক জঘন্য সামরিক হন্তারকের বীভৎস উল্লাসে সংঘটিত হয়েছিল। দেশরত্নের এসব গ্রন্থ আমাদের সকলের পাঠ করা দরকার। এসব গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আমরা তাঁকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারব, চিনতে ও জানতে পারব আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উদার নীতি ও মানবিকতার মর্মগাথা।

তার ডিজিটাল বাংলাদেশের অতুলনীয় আলোকোজ্জ্বল দর্শনের ফলে আজ বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে ভাগ্য পরিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বাধার সকল দুর্গম পথকে অতিক্রম করে আজ বিশ্বদরবারে বাঙালি জাতি ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের চুয়াল্লিশ বছরের ইতিহাসে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। সারা বিশ্বে তিনিই একমাত্র নেতা যিনি প্রতিনিয়ত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও দেশের জন্য, দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, বিশ্বমানবতার মহামুক্তির লক্ষ্যে দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তেজদীপ্ত অহংকারে শত বাধার আধারকে উপেক্ষা করে। তিনি জীবনমৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও পঁচাত্তরের মধ্য আগস্ট বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের রায় ঘোষণার মধ্যদিয়ে দেশে আইনের শাসন কায়েম করেছেন। আবার দীর্ঘ ৪০ বছর পর একাত্তরের পরাজিত খুনি ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করেছেন যা তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জিং ও দুঃসাহসিক কাজ। সে বিচারের রায়ও একে একে কার্যকর হচ্ছে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে।

কান্না-হাসির জগৎ পারাবারে আনন্দ-বেদনার হাজারো কহনকথা থাকে, থাকে অনেক সুখ-দুঃখের দীর্ঘ শোকগাথা। থাকে হাজারো না বলা কষ্টের শ্লোক, অব্যক্ত মনোযাতনার মহাকাব্যিক ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এত বিশ্ব কাঁপানো সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল স্বীকৃতি ও অসামান্য অবদানের আলোকোজ্জ্বল মহিমায় উদ্ভাসিত দশদিগন্ত। তারপরও যেন না পাওয়ার বেদনায় স্তম্ভিত তাবৎ মনোলোক, সমস্ত গৃহলোকে যখন রাতের জোছনারা আলোহারা। পূর্ণিমা রাতের চন্দ্রিমা ডানা যখন ঢাকা পড়ে মেঘের অশুভ আঁধারে তখন দু'চোখে ঘুম আসে না। তিনি একটি অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রবল প্রজ্ঞা আর পরম সহিষ্ণুতায় সমহিমায় আপনটানে অগ্রগতির সোনালি সোপান রচনায় এগিয়ে চলেছেন জনকের স্বপ্ন পূরণের দারুণ প্রত্যাশায় আলো-আঁধারে অনমনীয় মনোবলে। আর যেন আশাভঙ্গের বেদনাবিধূর ভয়ার্ত ঝড়ে নিরাশার দোলাচালে ঘুরতে না হয় আমাদের। সুনিপুণ সমাধানের আলোয় অমীমাংসিত সব আঁধার ভেঙে মীমাংসার সুরম্য মহাসড়ক বিনির্মাণে আমরা এগিয়ে যাবো মানবতার মুক্তির অনন্ত সাধনায়। বিশ্ব হবে শান্তি-সুখের অভয়ারণ্য। মানুষ কাজ করবে নির্ভয়ে, কেউ ছবি আঁকবে, কেউ লিখবে গান কবিতা। আপনার গৌরবোজ্জ্বল জয়ের ধারা অব্যাহত থাকুক, মাটিও মানুষের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আপনি শতভাগ সফল হবেন এ প্রত্যাশা ১৬ কোটি মানুষের। আপনার বীরত্বপূর্ণ পথচলায় বিশ্ববিবেক হবে চমকিত, আনন্দিত, বিস্মিত। আমরা মহানন্দে হারিয়ে যাবো স্বর্গের মনোরম সুনীল ঠিকানায়। প্রিয় নেত্রী, গণমানুষের পরম আপনজন, বাঙালির মুক্তির শেষ ঠিকানা, বীরজননী আপনার বীরত্বের গর্বিত অবয়বে যেদিন লক্ষ তারার হাসি ফুটবে, যেদিন আকাশের কালো মেঘ হারিয়ে যাবে দূর অজানায় , আমরা সেদিন চাঁদের বাঁধভাঙা আলোয় আনন্দবানে ভেসে বেড়াবো। সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছি আমরা।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

আঙ্কটাডের চতুর্দশ সম্মেলন ও বাংলাদেশের অর্জন

মো. শামীম আহসান

গত ১৬-২২ জুলাই কেনিয়ার নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয় UNCTAD বা জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের মন্ত্রী পর্যায়ের চতুর্দশ বৈঠক। বিশ্ব রাজনীতির সংঘাতময় অনিশ্চয়তা আর ৮ বছর ধরে চলমান অর্থনৈতিক অধোগতির প্রকোপের মাঝে গত বছর জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাইলফলক হিসেবে আবির্ভূত হলো 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'। তার ধারাবাহিকতায় গৌরবোজ্জ্বল অতীতের ধারক কিন্তু অধুনা প্রায় নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফলা 'আঙ্কটাড'—এর চতুর্দশ সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে 'আঙ্কটাড'-এর ঐতিহাসিক পটভূমির ওপর দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্ব বাণিজ্য উদারীকরণ সংক্রান্ত সব বিষয় 'গ্যাট' বা 'জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড' (GATT)-এর আওতায় আলোচিত হতে থাকে। সে আলোচনার মূলনীতি ছিল– কোনো একটি দেশ অপর কোনো দেশকে বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করলে তা পারস্পরিক বৈষম্যহীনতার ভিত্তিতে আর সব দেশকেও সমভাবে প্রদান করতে হবে। স্পষ্টত এ রকম সমঝোতা শুধু সমতুল্য দেশের মধ্যেই হওয়া সম্ভব। এছাড়া পণ্য বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ECOSOC) বিবেচ্য থেকে যায়। আর বহুপাক্ষিক সাহায্য ও দ্বিপাক্ষিক সাহায্য বিশ্বব্যাংক এবং ধনী দেশগুলোর ক্লাব 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা' (OECD)– এর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য দিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ক আলোচনার ফোরাম নির্ধারিত ছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা IMF।

চল্লিশ দশকের শেষ ভাগ থেকে পর্যায়ক্রমে বিশ্বে অনেক নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের অভ্যুদয় হয়। জাতি গঠনের সংগ্রামরত এসব দেশ ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে অন্তর্নিহিত সাযুজ্য সত্ত্বেও পৃথক পৃথক সংস্থায় উপর্যুক্ত বিষয়বস্তুর আওতাভুক্তি একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে। এ সময়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বৈষম্য ও অসহযোগিতার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলো সার্বিকভাবে জাতিসংঘের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার আওতায় আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খোঁজার বিষয়ে এ দেশগুলোর মাঝে ঐকমত্যের আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক মুক্তিতে প্রতিফলনের প্রয়াসে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে পাশে না পাওয়াও এর পেছনে ভূমিকা রাখে।

পাশাপাশি ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত বান্দুং সম্মেলনের মাধ্যমে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উন্মেষ, ১৯৬২ সালের কায়রো ঘোষণা ও এর পর পর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাণিজ্য ও উন্নয়নের ওপর একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পশ্চিমা দেশগুলোর বিরোধিতা সত্ত্বেও আঙ্কটাড-এর আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত করে।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ১৭ জুলাই ২০১৬ নাইরোবির কেনিয়া আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে জি-৭৭ এবং চায়নার মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় এলডিসি গ্রুপের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন – পিআইডি

১৯৪৮ সালে হাভানা সম্মেলনে ঘোষিত 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা' সৃষ্টির ধারণা ব্যর্থ হওয়ায় একটি বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভীপ্সার পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্য দিকে 'গ্যাট' আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন– পণ্য বাণিজ্য চুক্তি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাণিজ্য সুবিধা প্রদান স্থান না পাওয়ায় একটি বিকল্প সংস্থার দাবি জোরালো হয়।

সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে গৃহীত জাতিসংঘের পরবর্তী পনেরো বছরের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০' নির্ধারণের পর চতুর্দশ আঙ্কটাড মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন হলো জাতিসংঘের প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। তাছাড়া জুলাই ২০১৬ তে জাতিসংঘের 'ফাইন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট (FID)' কনফারেন্সে আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা (AAAA) গ্রহণ করা হয়েছে। এ দুটোর সাথে ২০১৫ সালের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কয়েকটি উদ্যোগ যেমন– 'সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক অন ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন', 'প্যারিস এগ্রিমেন্ট (কপ-২১)' এবং 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ১০ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সমঝোতায় বিশ্ব উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক নির্ধারণ করা হয়েছে। নাইরোবির এই চতুর্দশ আঙ্কটাড সম্মেলন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট ঐ এজেন্ডার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রথম পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা এ বছরের প্রতিপাদ্যে 'From decision to action: Moving towards an inclusive and equitable global economic environment for trade and development'– এ যথার্থই প্রতিফলিত হয়েছে।

ষাটের দশকের শুরু থেকে জাতিসংঘের 'বাণিজ্য ও উন্নয়ন' সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জিএসপি, আন্তর্জাতিক পণ্য চুক্তি, পণ্যের জন্য 'কমন ফান্ড' এবং 'ওডিএ' লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ চুক্তি বিষয়ে আঙ্কটাড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যা উন্নয়ন গতিধারায় অসামান্য ভূমিকা রেখে চলছে। তেমনি এফডিআই, এফডিআই সংশ্লিষ্ট ট্যাক্স ফাঁকি বা খেলাপ এবং ঋণ পরিশোধ কাঠামো সংশোধন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী সুপারিশ রেখেছে এ সংস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিগত ২০ বছরে, বিশেষত ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠনের পর, সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐকমত্য গঠনে আঙ্কটাডের ঐতিহ্যবাহী ভূমিকা ব্যাহত হয়েছে। এটি ঘটেছে মূলত এর আন্তঃসরকার ভূমিকাকে অনেকাংশে দুর্বল করার মাধ্যমে। যার ফলে বাণিজ্য ও উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটির গৌরবময় ভূমিকা হ্রাসের পাশাপাশি এর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডও কিছুটা খর্ব হয়েছে। সত্যি বলতে, আঙ্কটাড-এর কাজ এখন শুধুমাত্র কারিগরি সহায়তা প্রদান বা পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণে সীমিত বললে অত্যুক্তি হবে না।

২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বৈশ্বিক পর্যায়ের অন্যান্য সম্মেলনসমূহের সার্বজনীন লক্ষ্য বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে এসেছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সক্ষমতা অর্জন এখন সবচেয়ে জরুরি। এলক্ষ্যে আঙ্কটাড-এর আওতায় 'জি-৭৭ এবং চীন'-এর 'অবস্থান পত্র'– এর আলোকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর 'ইস্তাম্বুল কর্ম পরিকল্পনা' বা (IPOA) বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করার সুযোগ আছে।

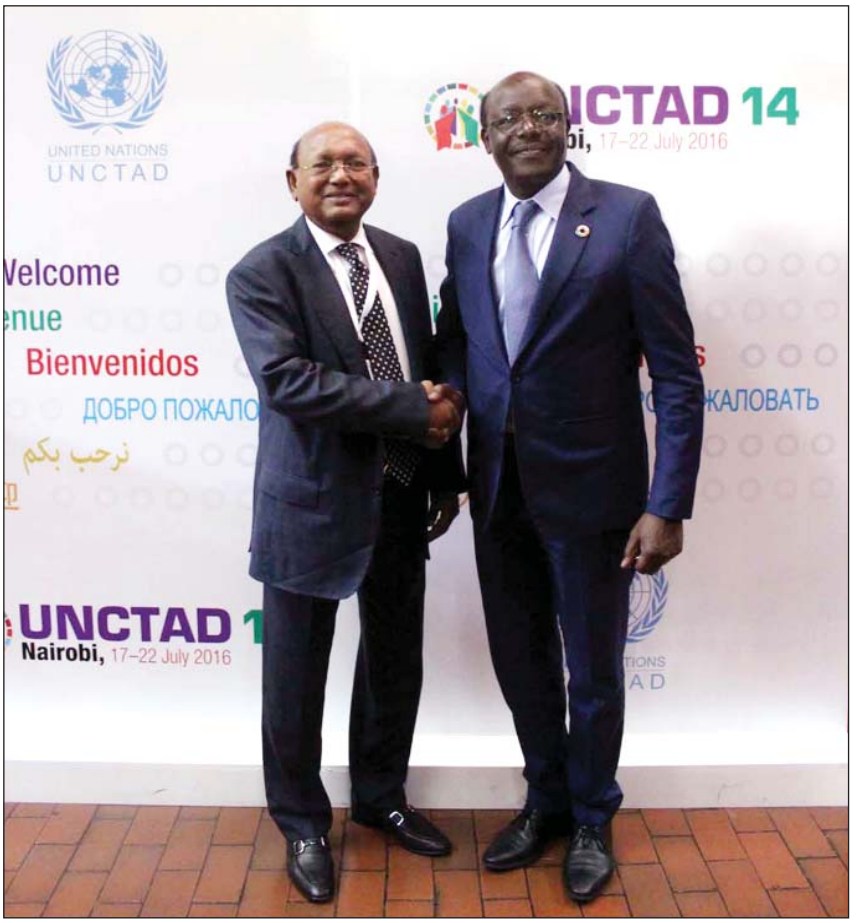

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ১৯ জুলাই ২০১৬ নাইরোবির কেনিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আঙ্কটাড-এর মহাসচিব ড. মুখিসা কিটুয়ি-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন –পিআইডি

উপরিউক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় এনে এ বছরের শুরুতে আসন্ন নাইরোবি সম্মেলনের প্রেক্ষিতে জেনেভায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন আঙ্কটাডের আন্তঃসরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (Intergovernmental Machinery বা IGM)- কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূল উদ্দেশ্য, যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০' বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংস্থাটি যেন কার্যকর সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিলের নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের অবদান

'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০' বাস্তবায়নে উন্নয়নশীল দেশসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আঙ্কটাডের আন্তঃসরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (IGM) গুরুত্বপূর্ণ সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে–এ

বিবেচনায় একে শক্তিশালী করতে জেনেভায় বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন প্রাথমিক আলোচনা শুরু করে। সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্যায়ে বিষয়টি উত্থাপনের প্রেক্ষিতে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গের মাঝে দুধরনের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তাদের ভাষায়, প্রথমত আঙ্কটাডের এ বিষয়ে তেমন কিছু করণীয় নেই এবং দ্বিতীয়ত এটি করতে গেলে অতিরিক্ত আর্থিক ও অন্যান্য সংশ্লেষের প্রয়োজন হবে যার সংস্থান না থাকায় এ প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য, চতুর্দশ আঙ্কটাড বৈঠকের চূড়ান্ত দলিলের খসড়ার ওপর আলোচনা ২০১৬ সালের প্রথম দিকে জেনেভায় শুরু হয়, যা নাইরোবিতে শেষ দিন পর্যন্ত চলমান থাকে। এমনকি শেষের তিন দিনে আলোচনা কখনো সারারাতব্যাপী চলেছে। জেনেভা এবং নাইরোবির নেগোসিয়েশনে চারটি গ্রুপ অংশগ্রহণ করে– 'জি-৭৭ ও চীন' (১৩৪টি উন্নয়নশীল দেশ), ইউরোপীয় ইউনিয়ন, JUSSCANZ (জাপান, ইউএস, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড) এবং গ্রুপ-ডি (প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ)। সম্মেলনে উত্থাপিত/আলোচিত বিভিন্ন ইস্যুতে প্রথম গ্রুপ ছাড়া বাকি অন্যান্য গ্রুপভুক্ত দেশসমূহ প্রায় একই মত পোষণ করে।

জেনেভায় নেগোসিয়েশন চলাকালে (IGM)-এর ওপর প্রস্তাব গঠন করার জন্য বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন অবস্থান পত্র জারি করে আলোচনার সূত্রপাত করে। তাছাড়া, অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সময়ে সময়ে অবহিত করা, খসড়া ডকুমেন্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রস্তাব গঠনে সহায়ক টেক্সট অন্তর্ভুক্তি, জি-৭৭ এবং চীন গ্রুপের সমন্বয়কে প্রস্তাবের ব্যাখ্যাসহ চিঠি লেখা, জি-৭৭ এবং চীনের সভায় প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য প্রদান, প্রস্তুতি কমিটির সভাপতিকে প্রস্তাবের ওপর ব্রিফিং প্রদান, জি-৭৭ এবং চীনের বাইরে অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনা করার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি দৃশ্যমান ও কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নাইরোবি সম্মেলনের সকল সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতি এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। সকলের নিকট প্রস্তাবটি নিয়ে পৌছানোর আন্তরিক প্রচেষ্টাই মূলত অন্যদের কাছ থেকে সমর্থন আদায় সম্ভব করেছে এবং পরিশেষে (IGM)–কে শক্তিশালী করার বিষয়টি সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিলের চতুর্থ 'সাব-থিম'-এ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করেছে।

এ প্রস্তাবনা অনুযায়ী, আঙ্কটাডে দুটি সরকারি বিশেষজ্ঞের দল (IGEG) গঠন করা হবে– একটি 'ই-কমার্স এবং ডিজিটাল ইকোনমি' এবং অন্যটি 'ফাইন্যান্সিং ফর ডেভেলপমেন্ট'-এর ওপর কাজ করবে। গ্রুপ দুটির রিপোর্ট আঙ্কটাডের সর্বোচ্চ আন্তঃসরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সভা বা 'ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ডে' উপস্থাপন করা হবে। এছাড়া নাইরোবি সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ আঙ্কটাডের চলমান কার্যক্রম এবং এর অগ্রগতির ওপর একটি মধ্যবর্তী রিভিউ সম্পন্নের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছায়, শুরু থেকে উন্নত রাষ্ট্রসমূহ যার বিরোধিতা করে আসছিল। আশা করা যায়, সব মিলিয়ে এসব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে আঙ্কটাড সম্মেলনে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐকমত্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা এ ধরনের অন্য যে-কোনো ফোরামে আইনি বা বাধ্যতামূলক চুক্তিতে পৌছাতে সাহায্য করতে পারে।

মূল্যায়ন

(IGM)- কে শক্তিশালী করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনাসমূহের অন্তর্ভুক্তিতে অনেক উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। আঙ্কটাড সচিবালয়সহ সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবর্গের অনেকে পুরো প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের উদ্যোগ ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। সম্মেলনের আগে ও সম্মেলন চলাকালে নেগোসিয়েশনের বিভিন্ন পর্যায়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ উৎসাহব্যঞ্জক সুপারিশ রেখেছে। নেগোসিয়েশনে যে সকল রাষ্ট্র আমাদেরকে সমর্থন করেছে ও প্রয়োজনে বাংলাদেশের প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে তারা উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপের সদস্য।

জাতিসংঘে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জেনেভা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সকল এজেন্ডা, প্রধানত সার্ভিস ওয়েভার, রুলস অব অরিজিন, স্পেশাল ও ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট, স্বল্পোন্নত পদমর্যাদা থেকে উত্তরণ, বৈশ্বিক পর্যায়ে রপ্তানি বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অংশ বৃদ্ধি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সদস্যপদ প্রাপ্তি এবং তুলা রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি চূড়ান্ত দলিলে অন্তর্ভুক্ত করতে সফল নেতৃত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশ প্রতিনিধিবর্গের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টার কারণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় স্বল্পোন্নত সকল দেশের সকল পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা প্রদানের কাজ এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করা সম্ভবপর হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু যেমন– ট্যাক্স ফাঁকি, প্রযুক্তি হস্তান্তর, ঋণ পরিশোধ কাঠামো পুনর্গঠন, নীতি-নির্ধারণে স্বাধীনতা (Policy Space)-এর বিষয়ে যথাযথ মূল্যায়ন এবং Common But Differentiated Resposibility (CBDR) ইত্যাদি বিষয় চূড়ান্ত দলিলে অন্তর্ভুক্তিতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নিরলস প্রয়াসে ট্যাক্স ফাঁকির বিষয়টি প্রথমবারের মতো ঐ দলিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্মেলনে প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নত রাষ্ট্রসমূহের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ইস্যুটিকে মেধাস্বত্ব অধিকার (IPR) রক্ষার বাধ্যবাধকতার সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিল, যা 'জি-৭৭ এবং চীন' গ্রুপভুক্ত দেশসমূহের বিরোধিতায় এড়ানো সম্ভবপর হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য আঙ্কটাড সম্মেলনের মন্ত্রী পর্যায়ের চতুর্দশ বৈঠকের চূড়ান্ত দলিলকে একটি বড়ো ধরনের সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে আঙ্কটাড তার অতীত ঐতিহ্যকে কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে। আশা করা যায়, সদ্য সমাপ্ত সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটিকে আগামী চার বছরের জন্য যে নতুন ও সম্প্রসারিত আজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

আন্তর্জাতিক ও বহুপাক্ষিক সম্মেলনের যে-কোনো 'অর্জন' বা সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা সবসময়ই একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে-কোনো 'চুক্তি স্বাক্ষর'কে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার বিবেচনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়ার একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তবে যৌথ নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা নিহিত চতুর্দশ আঙ্কটাড সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে। সেলক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের পক্ষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথাযথ 'ফলো আপ' ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন হবে।

লেখক : জাতিসংঘে ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, জেনেভা

স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু বদলে যাবে বাংলাদেশ

আবু নাছের টিপু

পদ্মা সেতু আজ আর স্বপ্ন নয়, দৃশ্যমান বাস্তবতা। প্রমত্তা পদ্মার ওপর নির্মিত হচ্ছে সেতু। চলছে মহা কর্মযজ্ঞ। এ সেতু বাংলাদেশের সামর্থ্যের প্রতীক। সাহসী এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতীক। আশা জাগানিয়া এ সেতু উন্মোচন করবে সাফল্য আর সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। উন্নয়নের সূচকে যোগ করবে নবমাত্রা। ইতোমধ্যে সেতু নির্মাণ প্রকল্পের সার্বিক কাজের ৩৭ শতাংশ শেষ হয়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ২৪টি পিলারের। এরই মধ্যে চীন থেকে মংলা বন্দর হয়ে নৌপথে মাওয়ায় এসে পৌঁছেছে সেতুর উপরিভাগের স্টিলের তৈরি মূল কাঠামো বা স্প্যান। ডিসেম্বর নাগাদ নদীবক্ষে দৃশ্যমান হবে সেতুর উপরি কাঠামো।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাথে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, সুষম উন্নয়ন যাত্রার পাশাপাশি এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সাথে সংযোগ রক্ষায় এ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে আশা করা যাচ্ছে, দেশের জিডিপি শতকরা ১.২৬ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এবং আঞ্চলিক জিডিপি বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে শতকরা ২.৩ ভাগ। প্রায় ২৮ হাজার ৭ শত ৯৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে দেশের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ ইতোমধ্যে এগিয়ে চলেছে। এরই নিজস্ব অর্থায়নে এ স্বপ্নের প্রকল্পের কাজ ২০১৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগ। সকল অঞ্চলকে বিভিন্ন সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উন্নয়নের গতিকে বেগমান করতে শেখ হাসিনা সরকার ২০০১ সালে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেন। মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করেন। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ইতোমধ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষে প্রকল্পটি রয়েছে এখন বাস্তবায়ন পর্যায়ে। এর আগে গত ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাজিরা এবং মাওয়া প্রান্তে প্রকল্পের নদীশাসন কাজ এবং মূল সেতুর নির্মাণ কাজের সূচনা করেন।

পেছনে ফিরে দেখা

- পদ্মার ওপর সেতু নির্মাণে ১৯৯৮ থেকে ২০০০-এ প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়। এরপর ২০০১ সালে জাপানের সহায়তায় সম্ভাব্যতা যাচাই হয়।
- ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করে।
- শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই পদ্মা সেতু নির্মাণকে অগ্রাধিকার

ভিত্তিতে গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে চূড়ান্ত করা পরামর্শক নিয়োগ দেয়।

- এ সময় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত নকশা প্রস্তুত করা হয়।

কার্যক্রম সময়কাল অর্থায়ন

- প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই ১৯৯৮-১৯৯৯ বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)
- সম্ভাব্যতা যাচাই ২০০৩-২০০৫ জাইকার অনুদান
- বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন এবং প্রকিউরমেন্ট
- ২০০৯-২০১৪ এডিবি (টিএ)ঋণ এবং জিওবি
- বাস্তবায়ন ২০১৫-২০১৮ বাংলাদেশ সরকার

দোতলা সেতুর নিচতলায় চলবে ট্রেন

পরিকল্পনা অনুযায়ী সেতুটি হচ্ছে দোতলা। নতুন নকশায় নিচে চলবে রেল এবং উপরে মোটরগাড়ি। সেতুর ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ১ শত ৬০ কিলোমিটার বেগে যাত্রীবাহী ট্রেন এবং ঘণ্টায় ১ শত ২০ কিলোমিটার বেগে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করতে পারবে। প্রতিদিন ৮০টি ট্রেন সেতুর ওপর দিয়ে উভয় দিকে চলাচলের সক্ষমতা নিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে রেলট্র্যাক। এছাড়া ডাবল কনটেইনার ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০১৮ সালে সেতুটি নির্মাণ কাজ শেষে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার দিনই ট্রেন চলাচলের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে আলাদা প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে রেললিংক স্থাপনে নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়ের চুক্তি সই হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা হতে পদ্মা সেতু পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা থেকে সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত ১ শত ৬১ কিলোমিটার রেললাইন স্থাপন করা হবে। ২০১৮ সালে সেতুর ওপর নির্মিত রেললাইনে মাওয়া পর্যন্ত ভ্রমণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে রেলপথ মন্ত্রণালয়।

পুনর্বাসন/অধিগ্রহণ

প্রকল্পের জন্য জুন ২০১৫ পর্যন্ত মোট জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ১ হাজার ২৩১ দশমিক ৪০ হেক্টর। ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১৩টি ভলিউম সমন্বয়ে প্রণীত সেফগার্ড পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে। পুনর্বাসন এলাকা তৈরি করতে নদীর মাটি খনন করে ভূমি পাঁচ মিটারেরও বেশি উঁচু করা হয়েছে। প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকায় বসতবাড়ির জন্য প্লট বরাদ্দ ছাড়াও নির্মাণ করা হয়েছে স্কুল, ক্লিনিক, মসজিদ, পুকুর ও বাজার। এছাড়া মার্কেট শেড, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ওভারহেড ট্যাঙ্ক, মিশ্র ফলের বাগান, খেলার মাঠ, পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেন, সীমানা প্রাচীরসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা সংবলিত পুনর্বাসন সাইট। নিশ্চিত করা হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা। মোট ক্ষতিগ্রস্ত ১৫৪০০ পরিবারের প্রায় ৩ হাজার পরিবারের পুনর্বাসন কাজ শেষ দিকে রয়েছে এবং ৩ হাজার পরিবারকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী স্থানে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৪৫৫ পরিবারকে প্রকল্প নির্মিত পুনর্বাসন সাইটে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং পুনর্বাসন সাইটগুলোতে বিভিন্ন সাইজের ২৬৩৪টি প্লট তৈরি করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১৪৫৫টি আবাসিক প্লট ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৩৮৪ ভূমিহীন পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণে স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নে নেওয়া হয়েছে নানান উদ্যোগ। এরমধ্যে রয়েছে– দরদাতা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রাক যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা এবং দরদাতা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও সততা পরীক্ষার জন্য দুই স্তরে দরপত্র আহ্বান। সংগ্রহ প্রক্রিয়ার যাবতীয় তথ্য প্রাপ্তিসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তির পরিপূর্ণ ছক তৈরি ছাড়াও প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের আর্থিক ও স্বার্থ সম্পর্কিত বিরোধ থাকতে পারে এমন বিষয় প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশের খ্যাতনামা প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং পুনঃদরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন ও মূল্যায়নে বিদেশি কনসালটেন্ট-এর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতি মাসে বিবিএ'র নিজস্ব ওয়েবসাইটে পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বিতরণকৃত অর্থের হিসাব, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তালিকা এবং প্রাপ্য টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে প্রকাশ করা হচ্ছে।

পদ্মা সেতুর সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির পাশাপাশি যানবাহন চলাচলও বাড়বে। এ বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি রেখে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে নানামুখী পরিকল্পনা

নিয়েছে। এরই মধ্যে মোস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর কাজিরটেকে আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংকসহ মাওয়া এবং পাচ্চর-ভাঙ্গা মহাসড়কের উভয় দিকে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। গত ১৩ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ কাজের সূচনা করেন। বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে লেবুখালী সেতু নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ হয়েছে।

পরিকল্পনাধীন এবং বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে—ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, খুলনা-মংলা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, কালনা সেতুসহ ভাটিয়াপাড়া-কালনা-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল সড়ক নির্মাণ, ভাঙ্গা-নগরকান্দা-বোয়ালমারি-মোহাম্মদ-মাগুরা সড়ক নির্মাণ, সাতক্ষীরা-আলিপুর-ভোমরা স্থল বন্দর সড়ক উন্নয়ন এবং ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

বদলে যাবে বাংলাদেশ

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সাথে সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এর ফলে এ অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়বে। বিভাগীয় শহর খুলনা ও বরিশাল, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন, সাগর কন্যা হিসেবে পরিচিত কুয়াকাটা, দেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর মংলা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থল বন্দর বেনাপোল ও ভোমরা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল।

এ সেতু নির্মাণের ফলে পর্যটনের অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। সুন্দরবন এবং কুয়াকাটার যোগাযোগ সহজতর হবে। গড়ে উঠবে আধুনিক মানের হোটেল-রিসোর্ট। পদ্মা সেতুকে ঘিরে পদ্মার দুই পাড়ে সিঙ্গাপুর ও চীনের সাংহাই নগরের আদলে আধুনিক শহর গড়ে উঠতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য অল্পসময়ে এবং কমখরচে ঢাকায় চলে আসবে। কৃষি-শিল্প-অর্থনীতি-শিক্ষা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে এ সেতু বিশাল ভূমিকা থাকবে।

পরিবেশ সুরক্ষা

বন বিভাগের মাধ্যমে চারটি পুনর্বাসন এলাকায় প্রায় ৩৭ হাজার গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

পদ্মা সেতুর অবকাঠামো

১. মূল পদ্মা সেতু

২. নদীশাসন

দৈর্ঘ্য : ১৩ দশমিক ৮ কিমি. (১.৮ কিমি. মাওয়া প্রান্ত. ১৪ কিমি. জাজিরা প্রান্ত)

৩. জাজিরা সংযোগ সড়ক

জাজিরা প্রান্তে ৫টি ব্রিজের জন্য নির্ধারিত স্থান

ক্রম	স্থানের নাম	স্পেন	দৈর্ঘ্য
১.	নাওডোবা	৭টি	১৯০ মিটার
২.	শিকারকান্দি	৪টি	১৫০ মিটার
৩.	কুতুবপুর	৫টি	১৫০ মিটার
৪.	বড়ো কেশবপুর	৭টি	২১০ মিটার
৫.	ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে	৯টি	২৭০ মিটার

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

মিজানুর রহমান মিখুন

মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো মেটানোর পর যেসব চাহিদা থাকে তারমধ্যে ভ্রমণ অন্যতম। অন্যদিকে এটি একটি বহুমাত্রিক শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা তৈরি হয়। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি অনুদান ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যথাযথ সমন্বয় সাধন করার পাশাপাশি সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থা দরকার পর্যটনের জন্য। পর্যটন শিল্পের উপাদান ও ক্ষেত্রগুলো দেশে-বিদেশে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের অধিকতর বিকাশ ঘটানো সম্ভব। বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশকে দেখার আগ্রহ রয়েছে প্রচণ্ড। কারণ প্রতিবছর দেশে পর্যটকদের আগমনের হার বাড়ছে। শুধু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঠিক করে তা বাস্তবায়ন করলে দেশের পর্যটন শিল্পকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই দেশের সমৃদ্ধ শিল্পে পরিণত করা যাবে। তবে এজন্য মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ এই শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা।

সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশের অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি, কৃষি সভ্যতা, ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো যুগ যুগ ধরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এদেশের বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর, পাখি ডাকা, ছায়া ঢাকা গ্রাম, নদনদী, দিগন্তপ্রসারী নয়নাভিরাম মনোরম পরিবেশ যে-কোনো পর্যটকের মন কাড়ে।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে পর্যটন হচ্ছে বিশ্বের একক সর্ববৃহৎ ও দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্প। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি ক্রিয়াশীল অনুঘটক হিসেবে পর্যটন শিল্পের অভ্যুদয় ঘটেছে। পর্যটনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সচল রেখেছে বিভিন্ন সেক্টরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণ। বিগত শতাব্দীতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত বিকাশের কারণে পর্যটন সর্ববৃহৎ শিল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে শুধুমাত্র দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, লালন ও বিকাশই হয় না, বরং তা জাতিগত সৌহার্দ্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিশ্ব অর্থনীতি, মানবিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে এ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনা করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বহুজাতিক সংস্থা আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে দেশে দেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে ভূমিকা রাখছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগারের এদেশে প্রায় পাঁচশ ছোটোবড়ো প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পর্যটন স্থান রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পর্যটকের সংখ্যা প্রায় ৯০ কোটি ধরা হচ্ছে এবং ২০২০ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬০ কোটি। পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিপুল সংখ্যক পর্যটকের প্রায় ৭৩ শতাংশ

কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত

ভ্রমণ করবেন এশিয়ার দেশগুলোতে। এছাড়াও বিশ্ব পর্যটন সংস্থার তথ্য মতে, ২০১৮ সালের মধ্যে এ শিল্প থেকে ২৯ কোটি ৭০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখবে ১০.৫ ভাগ। বাংলাদেশ যদি এ বিশাল বাজার ধরতে পারে তাহলে পর্যটনের হাত ধরেই বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতি।

আমাদের দেশে পর্যটনের জন্য যে সব অঞ্চল রয়েছে তার মধ্য থেকে কিছু অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

কক্সবাজার : কক্সবাজার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি পর্যটন শহর। এটি চট্টগ্রাম বিভাগের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫২ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। কক্সবাজার তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্রসৈকত, যা কক্সবাজার শহর থেকে বদরমোকাম পর্যন্ত একটানা ১২০ কি.মি. জুড়ে বিস্তৃত। এখানে রয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম সামুদ্রিক মৎস্য বন্দর এবং সাবমেরিন ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো পর্যটন কেন্দ্র।

হিমছড়ি : হিমছড়ি কক্সবাজারের ১৮ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে কয়েকটি প্রাকৃতিক ঝর্ণা রয়েছে। ভঙ্গুর পাহাড় আর ঝর্ণা এখানকার প্রধান আকর্ষণ। কক্সবাজার থেকে হিমছড়ি যাওয়ার পথে বামদিকে সবুজঘেরা পাহাড় আর ডানদিকে সমুদ্রের নীল জলরাশি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের সৃষ্টি করে। বর্ষার সময় হিমছড়ির ঝর্ণাকে অনেক বেশি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত বলে মনে হয়।

কুয়াকাটা : কুয়াকাটা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সমুদ্রসৈকত ও পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটকদের কাছে কুয়াকাটা 'সাগর কন্যা' হিসেবে পরিচিত। ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সৈকত বিশিষ্ট কুয়াকাটা বাংলাদেশের অন্যতম নৈসর্গিক সমুদ্রসৈকত। এটি বাংলাদেশের একমাত্র সৈকত যেখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়।

মাধবকু- জলপ্রপাত : সিলেট থেকে ৭০ কি.মি. এবং মৌলভীবাজার সদর থেকে ৭২ কি.মি. দূরে বড়োলেখা উপজেলায় মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত অবস্থিত। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলপ্রপাত হিসেবে সমধিক পরিচিত। এর উচ্চতা ১৬২ ফুট। এখানে ২৭২ ফুট পাহাড়ের উপর থেকে জলরাশি অবিরাম ধারায় নিচে পড়ছে। এই স্থানটি বাংলাদেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান এবং অসংখ্য পর্যটক এখানে আসে।

সুন্দরবন : সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি, যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্র উপকূলবর্তী লোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি।

ষাট গম্বুজ মসজিদ : ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। এটি বাংলাদেশের তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটি। ১৯৮৩ সালে ষাট গম্বুজ মসজিদকে ইউনেস্কো এই সম্মান প্রদান করে।

সুন্দরবন

ঝুলন্ত ব্রিজ, রাঙামাটি

হাতিরঝিল : হাতিরঝিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রামপুরা এলাকায়, যা জনসাধারণের চলাচলের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ প্রকল্প এলাকাটি উদ্‌বোধন ও জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয় ২০১৩ সালের ২ জানুয়ারি। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এটি ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার : কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ছেঁউড়িয়া গ্রামে কালীগঙ্গা নদীর তীরে বাউল সম্রাট লালন শাহের মাজার। তাঁর মৃত্যুর পর শিষ্যরা এখানেই গড়ে তোলে মাজার বা স্থানীয়দের ভাষায় লালনের আখড়া। বিশাল গম্বুজে তাঁর সমাধি ঘিরে সারি সারি শিষ্যের কবর রয়েছে। এ মাজারটি বাউলদের তীর্থস্থান। প্রতিবছর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে সাধু-ভক্তদের পাশাপাশি বাউল সম্রাটের টানে ছুটে আসে লাখো পর্যটকের দল। মাজারের পাশে রয়েছে লালন মিউজিয়াম। লালনের একটি দরজা, লালনের বসার জলচকি, ভক্তদের ঘটি-বাটি ও বেশকিছু দুর্লভ ছবি মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

পদ্মা বহুমুখী সেতু : পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে নির্মিতব্য বহুমুখী সেতু। দ্বিতলবিশিষ্ট এই সেতু নির্মিত হবে কংক্রিট আর স্টিল দিয়ে। যার ওপর দিয়ে যানবাহন আর নিচ দিয়ে ট্রেন চলবে। এই সেতুটি নির্মিত হওয়ার আগেই অনেক পর্যটক এখানকার কর্মযজ্ঞ দেখার জন্য ছুটে আসছেন। এর নির্মাণ কাজ শেষ হলে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হবে।

লালবাগ কেল্লা : লালবাগের কেল্লা বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ। মোঘল আমলে স্থাপিত এই দুর্গটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি পুরনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত, আর সে কারণেই এর নাম হয়েছে লালবাগ কেল্লা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তৈরি এই কেল্লাতে রয়েছে পরীবিবির মাজার, দরবার গৃহ, হাম্মামখানা, মসজিদ, দুর্গ ইত্যাদি। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে লালবাগ কেল্লার অবস্থান। এটি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনস্থল।

সেন্টমার্টিন : সেন্টমার্টিন হলো বাংলাদেশের অন্যতম প্রবাল দ্বীপ। অপূর্ব সুন্দর জায়গা সেন্টমার্টিন। সেন্টমার্টিন দ্বীপ টেকনাফ উপজেলা থেকে ৩৮ কি.মি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মাঝে অবস্থিত। পাথর, প্রবাল, সমুদ্রসৈকত আর নারিকেল গাছের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। এজন্য দ্বীপটি নারিকেল জিঞ্জিরা নামে পরিচিত।

রাঙামাটি : প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা রাঙামাটি। কাপ্তাই লেকের বুকে ভেসে থাকা ছোট্ট জেলা শহর আর আশপাশে সর্বত্রই রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় স্থান। এখানকার জায়গাগুলো বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাজে। তবে বর্ষার সাজ একেবারেই অন্য রূপ। রাঙামাটির ঝুলন্ত সেতু, রাজবন বিহার, চাকমা রাজার বাড়ি, শুভলং ঝর্ণা, কাপ্তাই হ্রদ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক জাদুঘর, কাসালং নদী উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র। তাই পর্যটকদের জন্য এটি আকর্ষণীয় স্থান।

খাগড়াছড়ি : সৃষ্টিকর্তা অপার সৌন্দর্যে সাজিয়েছেন খাগড়াছড়িকে। এখানে রয়েছে আকাশ-পাহাড়ের মিতালি, চেঙ্গি ও মাইনি উপত্যকার বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ ও উপজাতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা। যেদিকেই চোখ যায় শুধু সবুজ আর সবুজ। ভ্রমণবিলাসীদের জন্য আদর্শ স্থান। খাগড়াছড়ি পুরোপুরি পাহাড়ি এলাকা। এখানে গেলে শান্তিপুর অরণ্য কুটির, দেবতার পুকুর, মানিকছড়ির রাজবাড়ি, ধর্মপুর আর্ম বন বিহার, গরম পাহাড়, ঝুলন্ত ব্রিজ, আলুটিলা রহস্যময় গুহা, রিছাং ঝর্ণা এবং পাহাড়ি অদ্ভুত সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়।

জাফলং : সিলেট নগরী থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে গোয়াইনঘাট উপজেলায় এর অবস্থান। খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সীমান্তের ওপারে ডাউকি পাহাড় থেকে আসা

সেন্টমার্টিন

নীলগিরি

পিয়াইন নদীর প্রবাহে সৃষ্ট ঝর্ণাধারা জাফলংকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ এক লীলাভূমিতে পরিণত করেছে। এসব দৃশ্যপট দেখতে প্রতিদিনই দেশি-বিদেশি পর্যটকরা ছুটে আসেন। রূপকন্যা হিসেবে সারা দেশে এক নামে পরিচিত সিলেটের জাফলং।

ইদ্রাকপুর দুর্গ : মুন্সীগঞ্জ শহরের ইদ্রাকপুরে অবস্থিত ঐতিহাসিক এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জকে রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল এই দুর্গটি। বছরের প্রায় সময়ই এ দুর্গে পর্যটকরা আসেন।

নীলগিরি : নীলগিরি দেশের সর্বোচ্চ পর্যটন কেন্দ্র। বান্দরবান জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৭ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বান্দরবান থানচি সড়কের অনন্য সৌন্দর্য বেষ্টিত পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত। এর উচ্চতা ২২০০ ফুট। মেঘের সঙ্গে মিতালি করে এখানে মেঘ ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে নীলগিরিতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অপরূপ।

নীলাচল : বান্দরবান জেলার প্রবেশমুখেই অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ ফুট উচ্চতায় নীলাচল অবস্থিত। নীলাচল থেকে সমগ্র বান্দরবান শহর একনজরে দেখা যায়। এছাড়াও মেঘমুক্ত আকাশে কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এখানে সবসময়ই মেঘের খেলা চলে। এ পাহাড়ের ওপর নির্মিত দুটি পর্যটন কেন্দ্র থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার দৃশ্য দেখতে খুবই মনোরম।

চলনবিল : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বিলের নাম চলনবিল। পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় এটি। 'বর্ষার সুন্দরী' বলা চলে এই বিলকে। বর্ষায় কানায় কানায় পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে রূপের পসরা সাজিয়ে বসে।

আহসান মঞ্জিল : বুড়িগঙ্গার পাড় ঘেঁষে কুমারটুলী এলাকায় আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। মঞ্জিলটি রংমহল ও অন্দরমহল দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রাসাদটির উপরে অনেক সুদৃশ্য গম্বুজ রয়েছে। এছাড়া একটি জাদুঘরও রয়েছে এখানে।

মহাস্থানগড় : ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন পুরাকীর্তিটি বগুড়ায় অবস্থিত। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়া মহাস্থানগড়। মৌর্য, গুপ্ত, পাল এবং সেন আমলেও বগুড়ার বিশেষ প্রশাসনিক গুরুত্ব ছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে এটি অবস্থিত। এটি পর্যটকদের জন্যও দর্শনীয় স্থান।

শুভলং ঝর্ণা : রাঙামাটি জেলার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় জায়গাগুলোর মধ্যে শুভলং ঝর্ণা একটি। এটি শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই ঝর্ণা দেখতে সর্বক্ষণ পর্যটকের ভিড় লেগেই থাকে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে ঝর্ণাটি পতিত হয়েছে কাপ্তাই লেকে। এটি মূলত জলপ্রপাত। শুভলং-এর কাছে যেতে বাধা নেই, ফলে ঝর্ণার রূপমাধুর্য প্রাণভরে উপভোগ করা যায়।

সোমপুর মহাবিহার : সোমপুর মহাবিহার পাহাড়পুর বিহারে অবস্থিত। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধবিহার হিসেবে ব্যাপক পরিচিত। এটা পর্যটকদের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত গন্তব্য। কারণ এটি অনন্য স্থাপত্য এবং পর্যটন কেন্দ্র।

লাউয়াছড়া বন : মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে ৩০ কি.মি. দূরে কমলগঞ্জ উপজেলায় প্রায় ১২৫০ হেক্টর এলাকা জুড়ে এই উদ্যান অবস্থিত। এটি রেইন ফরেস্টগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঘন জঙ্গলের বুক চিরে চলে গেছে পাহাড়ি রাস্তা। দুই পাশে সারি সারি গাছ। তার মধ্যদিয়ে মধ্যদুপুর কিংবা সোনাঝরা সকাল অথবা বিকেলের নরম আলো লাউয়াছড়াকে করেছে আরো মোহনীয়।

কান্তজির মন্দির : কান্তজির মন্দির ১৮ শতকে নির্মিত একটি চমৎকার ধর্মীয় স্থাপনা। মন্দিরটি হিন্দু ধর্মের কান্ত বা কৃষ্ণের মন্দির হিসেবে পরিচিত। দিনাজপুর শহর থেকে ২০ কি.মি. উত্তরে এবং কাহারোল উপজেলা সদর থেকে ৭ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে এর

সোমপুর মহাবিহার

পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত

অবস্থান। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের পর্যটক এখানে আসে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম জাদুঘর। এই জাদুঘর ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ খোলা হয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের নানা ঘটনা এই জাদুঘরের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা জানতে পারবে।

পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত : চট্টগ্রামের সর্ব দক্ষিণে কর্ণফুলী নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনায় পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত সৈকত এবং প্রকৃতিপ্রেমীদের জন্য সেরা গন্তব্য। তারা নিজস্ব সফর স্মরণীয় করতে তাদের পরিবারের সঙ্গে এখানে ঘুরে বেড়ান। এটা পর্যটকদের জন্য জনপ্রিয় স্থান।

তাজহাট জমিদার বাড়ি : শত বছরের কীর্তি এই জমিদার বাড়িটি। রংপুরের তাজহাটে এর অবস্থান। রাস্তার দুই পাশে আকাশসম উচ্চতার নারিকেল গাছ রয়েছে। বাড়িটির সামনে ও পাশে দুটি পুকুর আছে। অনেক দর্শনার্থী এখানে বেড়াতে আসেন।

বিরিশিরি : বিরিশিরি বাংলাদেশের নেত্রকোনা জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি গ্রাম। এটি এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। বিরিশিরির মূল আকর্ষণ বিজয়পুর চীনামাটির খনি, রানী খং গির্জা, কালচারাল একাডেমি।

মনপুরা : বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং রুপালি দ্বীপ মনপুরা। মনপুরা উপজেলা দেশের মানুষের কাছে যেমন আকর্ষণীয় ও দর্শনীয় জায়গা তেমনি বিদেশিদের কাছেও।

নিঝুম দ্বীপ : ১০০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট প্রকৃতির এক অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি নিঝুম দ্বীপ। এ দ্বীপটি নোয়াখালী জেলার অন্যতম দ্বীপ হাতিয়া উপজেলা থেকে ৯৬ কি.মি. দক্ষিণে মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত। শুধু সৌন্দর্যেই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদেও রয়েছে এর বিশাল সম্ভাবনা। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে জেগে ওঠা দ্বীপটির একদিকে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গ, অন্যদিকে ছুটে আসা হিমেল হাওয়া আর সবুজের সুবিশাল ক্যানভাস দ্বীপটিকে দিয়েছে ভিন্ন এক রূপবৈচিত্র্য– যেন চিত্রশিল্পী সুনিপুণভাবে গড়েছেন জলরং তুলিতে।

উয়ারী বটেশ্বর : নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় অবস্থিত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান উয়ারী বটেশ্বর। মাটির নিচে অবস্থিত একটি দুর্গ নগরী। বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী এটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো নিদর্শন। এখানে দেশি-বিদেশি পর্যটকরা আসেন।

রমনা পার্ক : এই উদ্যানটি ১৬১০ সালে মোগল আমলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেই সময়ে রমনার পরিসীমা ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। মোগলরাই রমনার নামকরণ করেন। পুরনো হাইকোর্ট ভবন থেকে বর্তমান সড়ক ভবন পর্যন্ত মোগলরা বাগান তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে রমনা পার্কে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয়। রমনার বটমূলে ছায়ানটের আয়োজনে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এখন অনেক জনপ্রিয়। এ সময় দেশি-বিদেশি পর্যটকরা এখানে আসেন।

বঙ্গবন্ধু সেতু : এটি যমুনা নদীর ওপর অবস্থিত একটি সড়ক ও রেল সেতু। এর দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটার। এটি বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু। বঙ্গবন্ধু সেতুর সৌন্দর্য দেখতে প্রতিদিন দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক এসে ভিড় করে।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ কমপ্লেক্স : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ইতিহাসের ইতিহাস রচনা করেছিল কুষ্টিয়ার মেহেরপুরে অবস্থিত মুজিবনগর সরকার। এখানে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধও নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ৮০ একর জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে আছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। এখানে আছে বঙ্গবন্ধু তোরণ, অডিটোরিয়াম, শেখ হাসিনা মঞ্চ, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকেন্দ্র, মসজিদ, হেলিপ্যাড, ২৩টি কংক্রিটের দেয়ালের সমন্বয়ে উদীয়মান সূর্যের প্রতিকৃতিকে প্রতীক করে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, প্রশাসনিক ভবন, টেনিস মাঠ, পর্যটন মোটেল, স্বাধীনতা মাঠ, স্বাধীনতা পাঠাগার, বিশ্রামাগার, পোস্ট অফিস, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, শিশুপল্লি, ডরমেটরি ও মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র। এটি বর্তমানে অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

বাহাদুর শাহ পার্ক : বাহাদুর শাহ পার্ক বাংলাদেশের রাজধানী পুরনো ঢাকা এলাকার সদরঘাটের সন্নিকটে লক্ষীবাজারে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। যেখানে বর্তমানে একটি পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। এ স্থান বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী।

শিখা চিরন্তন : সোহরাওয়ার্দী উদ্যানস্থ শিখা চিরন্তন আমাদের দেশের অন্যতম একটি দর্শনীয় স্থান। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক বার্তা এই উদ্যান পৌঁছে দিচ্ছে। এটি দেখতে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী ভিড় করছে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি স্বাধীনতা যুদ্ধের

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর

শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপনা এবং পর্যটকদের জন্য একটি দর্শনীয় স্থান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স : হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত। প্রতিদিন দর্শনার্থী ও বিদেশি পর্যটকরা সমাধি সৌধ কমপ্লেক্সে এসে ভিড় করে এবং শ্রদ্ধা জানান।

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর : বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত। বাংলাদেশের স্থপতি ও প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটিই বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এ বাড়িটিতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের হত্যা করা হয়। এখানে তাঁর সারা জীবনের বিভিন্ন দুর্লভ ছবি এবং শেষ সময়ের অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। বাড়িটিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের বীভৎস ঘটনার সাক্ষী বহন করছে দেওয়াল এবং সিঁড়িতে গুলির চিহ্ন। তিনতলা ভবনটিকে বলা হয় বঙ্গবন্ধু ভবন। ১৯৯৭ সালে এই বাড়িটি জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়।

বিছানাকান্দি : সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার বাংলাদেশ সীমানা সংলগ্ন বিছানাকান্দি একটি সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান। সীমান্তের ওপারে উৎপন্ন পাহাড়ি ঝর্ণার পানি ও গোয়াইন নদীর সংগমস্থলটি বিছানাকান্দি নামে পরিচিত। এর স্বচ্ছ পানিতে নুড়ি পাথরের উপস্থিতি যে কাউকে মুগ্ধ করবে। পর্যটকদের জন্য এখানে নৌ ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে।

হাসন রাজার বাড়ি : মরমি কবি ও সাধক হাসন রাজা সিলেটের সুনামগঞ্জের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশায় ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে লক্ষণশ্রী গ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন ঐশীপ্রেমী এবং গানের বাণীতে নিজেকে 'পাগলা হাসন রাজা', 'উদাসী', 'দেওয়ানা', 'বাউলা' ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। এখানে অসংখ্য পর্যটক পরিদর্শনে আসেন।

মাধবপুর চা বাগান ও হ্রদ : মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে প্রায় ৫০ কি.মি. দূরে কমলগঞ্জ উপজেলার ৫ কি.মি. দক্ষিণে এর অবস্থান। এই চা বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে মনোমুগ্ধকর কৃত্রিমভাবে তৈরি মাধবপুর হ্রদ। এই হ্রদে আছে প্রচুর নীল শাপলা ও নীল পদ্ম। এই বাগানটি একটি পর্যটন স্পট এবং অনেক পর্যটক আসে এখানে।

তেলিয়াপাড়া স্মৃতিসৌধ ও বাংলো : মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মাধবপুর তেলিয়াপাড়া চা বাগান এবং বড়ো বাংলো একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই বাংলোতে বসেই মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা হয়েছিল। এখানে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মুহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী ৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কতিপয় অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এর পাশে নির্মাণ করা হয়েছে চমৎকার একটি স্মৃতিসৌধ এবং একটি মনোরম হ্রদ। এটি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাংলাদেশে পর্যটন সংশ্লিষ্ট বহুবিধ আকর্ষণসমূহ যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে পর্যটকদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করার অপার সুযোগ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বর্তমানে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো দূর করতে প্রয়োজন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কৌশল অবলম্বন। এলক্ষ্যে সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যটন স্থানগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান, জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ রাখা, ভিসা ব্যবস্থা সহজ করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পর্যটন পুলিশ গড়ে তোলা, পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো, দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ দরকার। এছাড়া পর্যটন স্থানগুলোর উন্নত মানের হোটেল, রেস্টুরেন্টের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি করা দরকার তেমনি উন্নত সেবাও নিশ্চিত করা দরকার।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও বাংলাদেশে শিক্ষার অগ্রগতি

শামসুজ্জামান শামস

পাঁচটি মৌলিক অধিকারের অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষার আলোহীন কোনো ব্যক্তিকে বর্তমান মানব সভ্যতায় মূল্যহীন বলেই গণ্য করা হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে জনগণের এই মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে, যেখানে শিক্ষা হবে অবৈতনিক। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ জনগণের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তারমধ্যে শিক্ষা খাতে ঐতিহাসিক সংস্কার ও যুগান্তকারী পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য আকাশচুম্বী। শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের পরিমাণ বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা'। তিনি আরো বলেছেন, 'শিক্ষা হলো বাইরের প্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন'। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত এবং অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। অন্যদিকে নানা সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে তার মানসিক বিকাশ হয়। উন্নত মানসিক বিকাশের ক্রমচর্চার মধ্যদিয়ে নৈতিকতার পরিগঠনের মাধ্যমে আত্মার শুদ্ধি ঘটে। এজন্য বলা হয়ে থাকে দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্য বিকাশই শিক্ষা। এক কথায়, পরিপূর্ণ মানব সত্তাকে লালন করে দেহ, মন ও আত্মার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিজেকে জাতির উপযোগী, যোগ্য, দক্ষ, সার্থক ও কল্যাণকামী সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার নামই শিক্ষা। শিক্ষা মানব জীবনের এক মূল্যবান সম্পদ। এ সম্পদ কখনো খোয়া যায় না বা বিলুপ্ত হয় না। বেঁচে থাকার জন্য, নিজেকে অভিযোজিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা ব্যক্তির উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন এবং দেশের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৬ সাল থেকে ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষকে তারা বলতে চায়, সাক্ষরতা একটি মানবীয় অধিকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ভিত্তি।

প্রতিবছর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সে বছর সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা চিহ্নিত করে এবং পরবর্তী সময়ে প্রতি দশকেই এই সংজ্ঞার রূপ পালটেছে। এক সময় কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য অন্তত তিনটি শর্ত মানতে হয়। ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবে, সহজ ও ছোটো বাক্য লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাব নিকাশ করতে পারবে। এই প্রত্যেকটি কাজই হবে ব্যক্তির প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বে বর্তমানে এই সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে সাক্ষরতার হিসাবনিকাশ করা হয়। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো এই সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করে, তবে বর্তমানে এটিও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত সে দেশের শিক্ষা। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। একটা সময় মনে করা হতো, যে দেশে যত বেশি প্রাকৃতিক সম্পদ, সে দেশ তত বেশি উন্নত। কিন্তু এখন ধারণা পালটেছে। এখন মনে করা হয়, যে দেশে যত বেশি শিক্ষিত, সে দেশ তত বেশি উন্নত। মানব উন্নয়নের প্রায় সব সূচকেই বাংলাদেশের উন্নয়ন বৈশ্বিক পর্যায়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী অর্থনীতি, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রসহ প্রধান ১২টি উন্নয়ন সূচকের মধ্যে ১০টিতেই বাংলাদেশ আজ তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোসহ দক্ষিণ এশিয়ার সব রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাদেশকে আজ দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য নিরসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্য দেশগুলোর সামনে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় নজিরবিহীন সাফল্য এনেছে। বছরের প্রথম দিনে সকল

প্রাইমারি, মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসায় বিনামূল্যে বই বিতরণ সারা বিশ্বে একটি নজিরবিহীন ঘটনা।

সরকার দেশের প্রায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেছে। পিএসসি ও জেএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৪ হাজার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সব শিক্ষা স্তরে তথ্যপ্রযুক্তিকে আলাদা বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা তহবিল গঠন করে স্নাতক পর্যন্ত উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। বর্তমানে দেশে ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন প্রত্যেক জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা আর শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে রীতিমতো ঘটে গেছে বিপ্লব যা বিশ্বের বহু দেশের কাছে অনুকরণীয়। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগ, ছাত্রছাত্রীর সমতা, নারী শিক্ষায় অগ্রগতি, ঝরে পড়ার হার দ্রুত কমে যাওয়াসহ শিক্ষার অধিকাংশ ক্ষেত্রের রোল মডেল এখন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে গেলেও শিক্ষার অগ্রগতিতে গত এক দশকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। সরকারি ভাষ্য নয় বরং বিশ্বব্যাংক, ইউনেস্কো, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামসহ আন্তর্জাতিক দাতা ও গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষার অগ্রগতিকে অন্যদের জন্য উদাহরণ অভিহিত করে বলছে, শিক্ষায় প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। একদশকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়ে দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও টেকসই। শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে বাংলাদেশ ছুঁয়েছে নতুন মাইলফলক।

বিশ্বব্যাংক তার সর্বশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিক্ষার অগগ্রতির ভূয়সী প্রশংসা করে তুলে ধরেছে সরকারের উদ্যোগ ও অর্জনের নানা দিক। বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই তুমুল গতিতে দুস্তর পথ অতিক্রম করেছে এবং শিক্ষায় অভিগম্যতা ও সমতা অর্জনে অনেক দূর এগিয়েছে। মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ হওয়ায় বাংলাদেশ টেকসই ফল বয়ে নিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে লাখ লাখ শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা, নারী সাক্ষরতা বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার হার নিশ্চিত করার সরকারি উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বিশ্বব্যাংক বলেছে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় ভালো করার পেছনে বড়ো ভূমিকা রাখছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়ায় শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুণগত মান নিয়ে প্রবেশ করছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ আধুনিকীকরণ ও যথাসময়ে পাঠ্যবই বিতরণ শিক্ষার অগ্রগতিতে বড়ো ভূমিকা রাখছে। ২০০৫ সালে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার যেখানে ছিল ৮০ শতাংশেরও বেশি, সেখানে এই মুহূর্তে ঝরে পড়ার হার কমে দাঁড়িয়েছে ৫৩ দশমিক ২৮ শতাংশে। দেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক লাখ ১৪ হাজার ১১৪টি। যদিও সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা কিছু কওমি মাদ্রাসা দেশে প্রতিষ্ঠিত আছে। সারা দেশের এক লাখ ১৪ হাজার ১১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করছে তিন কোটি ছয় লাখ ৩৭ হাজার ৪৯১ জন শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরে বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ যেখানে ৪৯ শতাংশ সেখানে বাংলাদেশে দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৫০ দশমিক ৩৯ শতাংশ এবং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ৫২ শতাংশই ছাত্রী। মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের অংশগ্রহণে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পরের অবস্থান ভুটানের। এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রী হচ্ছে ৪৯ শতাংশ। এছাড়া মালদ্বীপ ও ইরান ৪৭, ভারত ৪৫, নেপাল ৪৩ এবং আফগানিস্তানে ছাত্রীর অংশগ্রহণ ৩১ শতাংশ।

বাংলাদেশের নারী শিক্ষাসহ সার্বিক শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায় বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের লিঙ্গ বৈষম্য সূচকের দিকে তাকালেও। অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীর ক্ষমতায়ন–এই মাপকাঠির বিচারে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের 'লিঙ্গ বৈষম্য সূচক'-এ ধারাবাহিক অগ্রগতি ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। বিশ্বের ১৪২টি দেশে নারীর পরিস্থিতি নিয়ে করা এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৮তম, যেখানে গত বছর ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ৭৫ নম্বরে। এ সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

আর পাকিস্তান রয়েছে শেষের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে। জেনেভা ভিত্তিক বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম 'বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন ২০১৪'তে দেখা গেছে সূচকে বাংলাদেশের অবস্থনের উন্নতির পাশাপাশি স্কোরেও অগ্রগতি হয়েছে। ২০১৩ সালে যেখানে বাংলাদেশের স্কোর ছিল শূন্য দশমিক ৬৮৫, এক বছর পর তা বেড়ে শূন্য দশমিক ৬৯৭ হয়েছে। শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের অগ্রগতি লক্ষণীয়।

২০১৩ সালে ১৩৬টি দেশের মধ্যে ১১৫তম অবস্থানে থাকলেও ২০১৪ সালে তা এগিয়ে ১১১তম অবস্থানে এসেছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। ৮০ শতাংশ নারীই ছিল অশিক্ষিত। আজ শিক্ষিত ৫০ শতাংশেরও বেশি নারী। মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন সবার ওপরে। দশ বছর আগে যেখানে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল ৬১ শতাংশ, সেখানে এখন বিদ্যালয়মুখী শতভাগ শিশু। এ সময়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। মূলত শিক্ষায় অর্জন অন্য যে-কোনো উন্নয়ন খাতের তুলনায় বেশি বাংলাদেশের।

বর্তমান সরকার ভিশন ২০২১ কে সামনে রেখে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য 'শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার' বিবেচনায় নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

'জাতীয় শিক্ষানীতি–২০১০' পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরে পড়া রোধের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে। ২০১০ থেকে ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রায় ১৪ কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে প্রায় ১২৪ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। বিশ্বের কোনো দেশে এত বই বিনামূল্যে বিতরণের কোনো রেকর্ড নেই। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিকুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরি করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং উক্ত নতুন বইসমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার্থীসহ মোট প্রায় ১৩৩.৭০ লাখ শিক্ষার্থীকে প্রায় ২২৪৫.৬৫ কোটি টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এই ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১ হাজার কোটি টাকা সিড মানি প্রদান করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য এ ফান্ড থেকে ১ লাখ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীকে মোট ৭৫ কোটি ১৫ লাখ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তাছাড়া, মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমেও এই ফল অতি দ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএসের মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা দেশে 'আইসিটি ফর এ্যাডুকেশন ইন সেকেন্ডারি অ্যান্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮ হাজার ৫০০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট, মডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডায়নামিক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ভার্সন উন্নয়ন করে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। ফলে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ, যে-কোনো সময়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সারা দেশে ১ হাজার ৬২৪টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছে। ফলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক- কর্মচারীর কর্মসংস্থানসহ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার

মাহবুব রেজা

আদিবাসী বাঙালি যত প্রান্তজন
এসো মিলি, গড়ে তুলি সেতুবন্ধ।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই অঞ্চলের মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তার অস্তিত্ব রক্ষায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে, যুদ্ধ-বিগ্রহে এক থেকেছে। নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছে এক অলিখিত মানবতার সেতুবন্ধ। মিলিত ঐক্যে তারা কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে এগিয়ে গেছে। সভ্যতার ইতিহাস আমাদের এই সাক্ষ্যই দেয় যে, একটি জাতির এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস হলো সেই জাতির ভেতরে বসবাস করা সব ধরনের মানুষের সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। বাংলাদেশও এই ইতিহাসের বাইরে নয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬ (২)-এ লেখা আছে, 'বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি' (সংবিধান [পঞ্চদশ সংশোধন] আইন, ২০১১)।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইএলও কনভেনশন নং ১০৭ অনুসমর্থন করেন। ঐ কনভেনশনে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমি ও বনের ওপর সনাতনী অধিকারের স্বীকৃতি আছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ঔদার্য দিয়ে একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশের মধ্যে থাকা শত শত বছরের জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি আদিবাসীদের সনাতনী অধিকারসহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি কাজও শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলোর স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এবং আদিবাসীদের ব্যাপারে সীমাহীন উপেক্ষার কারণে আদিবাসীরা তাদের অধিকার থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলার প্রতিটি মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেখানে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো দেশের আদিবাসীরাও দেশমাতৃকার টানে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছিল। শত্রুর হাত থেকে দেশকে, দেশের মাটিকে মুক্ত করেছিল। দেশ স্বাধীনের পর আদিবাসীরা ফিরে যায় তাদের যাপিত জীবনে।

আদিবাসী বলতে আমরা কাদেরকে বুঝি কিংবা এই আদিবাসী শব্দটিই বা আমরা কেন ব্যবহার করি? নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা যায়, ১৭৯৮ সালে ইংরেজরা উপজাতি না বলে নেশন লিখত। ১৮০০ শতকে ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীরা উপজাতি শব্দটি ব্যবহার করতে শুরু করেন। উপজাতি শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে ইংরেজি 'ট্রাইবা' শব্দকে ভিত্তি করে। পশ্চিমের সমাজ-নৃবিজ্ঞানীদের জাতি গবেষণা ও এথনোগ্রাফ রচনার ভেতর দিয়ে 'ট্রাইবাল' শব্দটি এই জনপদে হাজির হয়। সাঁওতাল হুলের সময় ব্রিটিশরা বিদ্রোহী সাঁওতালদের 'অপরাধী ট্রাইব' হিসেবে আখ্যায়িত করত। হাজংদের টংক আন্দোলনের সময় 'বিধর্মী কমিউনিস্ট' বলে গালি দেওয়া হতো। হাতিখেদা আন্দোলনের সময় হাজংদের বলা হতো 'রাজা অবাধ্য'। লোধা/শবর আদিবাসীদের সবসময় ব্রিটিশরা বলতো 'ক্রিমিনাল ট্রাইব'। ঔপনিবেশিক-বৈষম্যমূলক-কর্তৃত্ববাদী–এই অপর করে রাখার 'ট্রাইব্যনাল' শব্দটিই বাংলায় পরবর্তী সময়ে 'উপজাতি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে চাকমাদের আমন্ত্রণে বাঙালিরা ১৮১৮ সাল থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে জুম চাষের জন্য প্রথম রাঙ্গামাটি আসে। এ সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ অনুযায়ী শাসিত হয়। ১৭৯৮ সালে একটি সরকারি কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত ফ্রান্সিস বুকানন সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের ১০ ভাষাভাষী জুম্ম জনগোষ্ঠীর ভাষাগুলোর নমুনা শব্দ সংগ্রহ করেন। তারপর ফেইরি (১৮৪১), হান্টার (১৮৬৮) এবং লেউইন (১৮৬৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের কয়েকটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করলেও ড. জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের

আদিবাসী ভাষাগুলোর তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। লিঙ্গুয়েস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ভাষাগুলোর মধ্যে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাষাকে ইন্দো-এশিয়ান এবং অন্য ভাষাগুলোকে তিব্বতি-চীন পরিবারভুক্ত করে শ্রেণিকরণ করেন। তিব্বতি-চীন পরিবারভুক্ত ভাষাগুলোর মধ্যে মারমা ভাষাকে টিবেটো-বর্মি দল, ত্রিপুরা ভাষাকে বোডো দল, লুসাই, পাংখোয়া, বুম খিয়াং, খুমী, ম্রো ও চাক ভাষাসমূহকে কুকি-চীন দলভুক্ত করেন।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতা তার আপন গতিতে ধাবমান। সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, আদিবাসীরা হলো সভ্যতার বরপুত্র। সভ্যতার চাকা অগ্রবর্তিত হয়েছে আদিবাসীদের হাতে। সভ্যতার জীয়ন কাঠিও আদিবাসীদের হাতে পত্রপল্লবিত হয়েছে। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদিবাসীদের তাই খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের অবদানকে স্মরণ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর তথ্যপ্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে পৃথিবীর কোথাও কোথাও আদিবাসীদের আর আগের মতো মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। নানাভাবে তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । সে কারণে পরিবর্তিত ধ্যানধারণার সাথে তাল মিলিয়ে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসীদের ভূমি, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অধিকার, শিল্প, সংস্কৃতি সংরক্ষণসহ সব বিষয়কে আরো সংহত করতে প্রায় দুই দশকের নানান কার্যক্রমের বিচার বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে জাতিসংঘের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক সনদ তৈরি করা হয়েছে। ১৯৮২ সালে জাতিসংঘে প্রথম আদিবাসী বিষয়ক আলোচনা শুরু হয় এবং এর অস্তিত্ব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকার করা হয়। প্রায় একদশক পরে দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৯৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিবছর ৯ আগস্টকে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয় (রেজ্যুলেশন ৪৯/২১৪)। ৯ আগস্টকে তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করার পেছনে প্রধান কারণ ছিল, ১৯৮২ সালের এই দিনেই জাতিসংঘ সর্বপ্রথম আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়। তারপরের বছর থেকে ১৯৯৫-২০০৪ 'প্রথম আদিবাসী দশক' এবং ২০০৫-২০১৪ 'দ্বিতীয় আদিবাসী দশক' ঘোষণা করা হয়।

'প্রথম আদিবাসী দিবসে'র লক্ষ্য ছিল– আদিবাসীদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, ভূমি, পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সমস্যা দূরীকরণে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ। 'দ্বিতীয় আদিবাসী দিবসে'র লক্ষ্য ছিল– আদিবাসীদের জীবনের নানান রিসোর্সের কার্যকর প্রয়োগ ও সম্মানের জায়গা নিশ্চিতকরণের জন্য অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা। অবশেষে ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আদিবাসী অধিকার সনদ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাস হয়। যেখানে চারটি দেশ (আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড) এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং ১১টি দেশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখে। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে প্রতিবছর গুরুত্বের সঙ্গে ৯ আগস্ট রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' পালন শুরু করে। এছাড়া ২০০৮ সালের আওয়ামী লীগের নির্বাচনি মেনিফেস্টোতেও আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময়ই আদিবাসীদের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসটিকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে দেখেন এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিবছরের ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব আদিবাসীদের 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে শুভেচ্ছা জানান।

নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'ইন্ডিজেনাস' শব্দের অর্থ 'আদিবাসী'– যা এক ধরনের সাংস্কৃতিক ক্যাটাগরি আর 'আরলিয়েস্ট মাইগ্রেন্টস' অর্থ হচ্ছে 'আদি বাসিন্দা'– যা একটি ডেমোগ্রাফিক ক্যাটাগরি যা বসতি স্থাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। হাজার বছরের বাঙালির নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বলে এতদঞ্চলের আদি বাসিন্দারা কোনোকালেই বাঙালি ছিলেন না। ইতিহাসের নিরিখে যদি ধরে নেওয়া হয়, আদিবাসীদের আগমনের পূর্বেই এদেশে বাঙালিদের বসতি ছিল অর্থাৎ বাঙালিরাই এতদঞ্চলের আদি বাসিন্দা। তাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, বাঙালিরা এতদঞ্চলের 'আদি বাসিন্দা' কিন্তু 'আদিবাসী' নয়। কেননা, সাধারণত কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনুপ্রবেশকারী বা দখলদার জনগোষ্ঠীর আগমনের পূর্বে যারা বসবাস করত (এটা উপনিবেশিকতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পৃক্ত যা আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কেননা এতদঞ্চলের ইতিহাস একে সমর্থন

করে না) এবং এখনো করে, যাদের নিজস্ব ও আলাদা সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ রয়েছে যারা নিজেদের আলাদা সামষ্টিক সমাজ-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা সমাজে সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু হিসেবে পরিগণিত–তারাই আদিবাসী।

২০১৬ সালের জাতিসংঘের ঘোষণায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকারের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ তার ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করেছে, ২০৩০ সালের জন্য যে টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা (Sustainable Development Goal 2030) গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালে প্যারিসে জলবায়ু চুক্তি (Paris Climate Agreement 2015) স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেখানে এ পৃথিবীর বসবাসকারী সকলের জন্য একটি সমমর্যাদার সহাবস্থান নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এ দুটি এজেন্ডায় প্রথমবারের মতো এরকম একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে একটি স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সকলের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অনেকেই এখনো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূলধারার জনগোষ্ঠীর তুলনায় শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। এসব দিক বিবেচনায় রেখে ২০০৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার ঘোষণাপত্রে' (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বাংলাদেশ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মূল্যায়নে বদ্ধ পরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে আদিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সরকার আন্তরিক। প্রতিবছরের মতো এ বছরও অর্থাৎ ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। এবছরের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক দিবসের (International Day of the World's Indigenous Peoples) মূল ভাবনা বা প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, 'আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার' (Indigenous Peoples Right to Education) কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়া। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে বিশ্বের প্রায় নব্বইটি দেশের সাত হাজার ভিন্ন ভাষাভাষীর পাঁচ হাজার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সাঁইত্রিশ কোটি আদিবাসী মানুষ বিশ্ব আদিবাসী দিবস পালন করছে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল ভাবনা বা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল– '২০১৫ উত্তর উন্নয়ন লক্ষ্য : আদিবাসী জাতিসমূহের স্বাস্থ্যসেবা এবং কল্যাণ নিশ্চিতকরণ'। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ে সাতটি প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল।

১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আদিবাসী মানুষের যথাযথ স্বীকৃতি

২. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক অধিকার নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে জমি, চাষযোগ্য ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা নিশ্চিতকরণ

৩. শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃসংস্কৃতিক বা স্বতন্ত্র সংস্কৃতিবান্ধব নীতি প্রণয়ন

৪. আদিবাসী নারী, শিশু, যুবক এবং আদিবাসী প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক এরকম বিশেষ বিষয় এবং নীতিগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ

৫. সংস্কৃতিকে টেকসই উন্নয়নের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্তকরণ

৬. আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আদিবাসীদের সম্মতি এবং আদিবাসীদের আগে থেকেই অবহিতকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ

৭. আদিবাসী সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন এজেন্ডায় এবং পরিকল্পনায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

নৃতাত্ত্বিক গবেষক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা বলছেন, একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু ভাষাভাষীদের রাষ্ট্র। সংবিধানেও এর স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল জাতিগোষ্ঠীর অবদান ও আত্মত্যাগকে সমভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের ভেতরে বসবাসরত সকল জাতিগোষ্ঠীর কথা স্মরণে রেখে আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। যে কারণে সংবিধানে দেশের নাম 'পিপলস রিপাবলিক' বলা হয়েছে। তাই তারা বলছেন, দেশের আদিবাসীদের জন্য যেসব অধিকারের উল্লেখ আছে তার শতভাগ বাস্তবায়ন করে এদেশে বসবাসকারী আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে আদিবাসীবান্ধব একটি জাতীয় পলিসিও প্রয়োজন বলে তারা মনে করছেন। বর্তমান সরকার ও প্রধানমন্ত্রী আদিবাসীদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার রক্ষায় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ফোরামে আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় উচ্চকণ্ঠ। বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে গেলে কাউকে বাদ দিয়ে নয় বরং সবাইকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে সবার আগে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও সাংবাদিক

প্রবন্ধ

শরতে বাংলাদেশ

দুর্জয়

শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে–
বনের পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি। –রবীন্দ্রনাথ

ঋতু-রঙ্গমঞ্চে যখন অগ্নিক্ষরা গ্রীষ্মের আতঙ্ক-পাণ্ডুর বিবর্ণতা মুছে গেছে, যখন বর্ষার বিষণ্নবিধুর নিঃসঙ্গতা আর নেই, তখনই নিঃশব্দ চরণ ফেলে শরতের আবির্ভাব। মুখে তার প্রসন্ন হাসি। অঙ্গে তার স্বর্ণবরণ মোহন কান্তি। তার স্নিগ্ধ রূপ-মাধুর্য সহজেই আমাদের মনকে নাড়া দেয়। শরৎ যে পূর্ণতার ঋতু। শরৎ আসে হালকা চপলা ছন্দে। এসেই মেঘ আর রৌদ্রের লুকোচুরি খেলায় মাতে। শরৎ শুভ্রতার প্রতীক। গাছের পাতায় ঝকঝকে রোদের ঝিলিক, ভরা নদীর পূর্ণতা, নদী তীরে ফুটে থাকা অজস্র কাশফুল, শিউলি আর সারা আকাশ জুড়ে তুলোর মতো শুভ্র মেঘ– এসবই জানিয়ে দেয় শরৎ এসে গেছে। তাই রৌদ্রবরণ, শুভ্রতার প্রতীক শরৎই প্রিয় ঋতু।

বর্ষার অবসানে তৃতীয় ঋতু শরৎ এক অপূর্ব শোভা ধারণ করে আবির্ভূত হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মিলে শরৎকাল। ভাদ্র (সেপ্টেম্বর) মাসে তাপমাত্রা আবার বৃদ্ধি পায়, আর্দ্রতাও সর্বোচ্চে পৌঁছে। শরৎকালে বনে-উপবনে শিউলি, গোলাপ, বকুল, মল্লিকা, কামিরী, মাধবী প্রভৃতি ফুল ফোটে। বিলে-ঝিলে ফোটে শাপলা আর নদীর ধারে কাশফুল। এ সময়ে তাল গাছে তাল পাকে। হিন্দুদের দুর্গাপূজাও এ সময় অনুষ্ঠিত হয়।

ঋতু রঙ্গশালায় শরৎ আর বসন্ত হলো শুদ্র। 'একজন শীতের আর একজন গ্রীষ্মের তলপি বহন করিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাত। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেইখানেই সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আবরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগড়ির পরে সোনার কলকা, বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে পাদুকা পরিয়া ধরণী পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডুলে কুণ্ডুলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই'।

হালকা কুয়াশা আর বিন্দু বিন্দু জমে ওঠা শিশির, শারদ প্রভাতের প্রথম জলজ্জা উপহার। এর ওপর যখন সূর্যের আলো পড়ে

তখন মনে হয় চারদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র মুক্তদানা। যথার্থই শরতের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের তুলনা নেই। আকাশে এখন গাঢ় নীলিমার অবারিত বিস্তার। ক্ষান্ত-বর্ষণ সুনীল আকাশের পটভূমিকায় জলহারা লঘুভার মেঘপুঞ্জ। ধীর মন্থর ছন্দে তার কেবলই সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা। দিকে দিকে তার প্রসন্ন হাসির নম্র আভা। নদী-সরসীর বুকে কুমুদ-কমলের নয়ন-মুগ্ধকর সমারোহ-শোভা। দিগন্ত বিস্তার সবুজ ধানের খেত। তার শ্যামশস্য হিল্লোলে আনন্দ-গুঞ্জর। গাছে গাছে পত্রপল্লবে সবুজের ছড়াছড়ি। প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে শেফালি-সৌরভ। আঙিনায় আঙিনায় গুচ্ছ গুচ্ছ দোপাটির বর্ণসজ্জা। নদীকূলে কাশের বনে শুভ্র তরঙ্গ-কম্পন। প্রভাতে তৃণপল্লবে নবশিশিরের ভীরু স্পর্শ। তাতে অরুণ আলোর রক্তআভার লজ্জানম্র ভুবন-ভোলানো রূপ-কান্তি। গাছে গাছে, ডালে ডালে দোয়েল-পাপিয়ার প্রাণ মাতানো সুর-মূর্ছনা। নৈশ নীলাকাশে রজতশুভ্র জোছনার উদাস করা হাতছানি। শারদ-লক্ষ্মীর এই অপরূপ রূপলাবণ্য মাতৃভূমিকে করেছে এক সৌন্দর্যের অমরাবতী।

স্নিগ্ধতা আর কোমলতার এক অপূর্ব রূপ নিয়ে আসে শরতের রাত। শরৎ রাত্রির চাঁদ সারারাত ধরে মাটির শ্যামলিমায় ঢেলে দেয় জোছনাধারা। মাঝে মাঝে বয়ে যায় স্নিগ্ধ বাতাস। দূর থেকে ভেসে আসে শিউলির সুবাস। মন কিছুতেই ঘরে আটকে থাকতে চায় না। কেবলই ছুটে যেতে চায় বাইরে। ঝকঝকে জোছনায় পাখিদের ভ্রম হয়। ভোর হয়ে গেছে ভেবে ডেকে ওঠে কাক। ভোর হতে না হতেই শিশিরসিক্ত শিউলি ঝরে পড়ে সবুজ ঘাসে। কমলা বোঁটায় তখনও টলমল করে জলের কণা। কবি-হৃদয় চঞ্চল হয়। লেখে কবিতা কিংবা গান:

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা
নবীন ধানের মঞ্জরি দিয়ে সাজায়ে এনেছি বরণডালা।

শরতে নীল সরোবরে পদ্মের সাথে হৃদয় মেলে ফুটে ওঠে বাংলাদেশের প্রাণ। শরতে কেবলি বর্ণের স্নিগ্ধতা আর উদারতা। সবুজ, নীল আর সাদার এমন অপূর্ব সমন্বয় আর কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। জননী বাংলাদেশ আপনার হৃদয় উজাড় করে মেলে ধরে এই শরতে।

শরৎ ফসলের ঋতু নয়। আগামী ফসলের সম্ভাবনার বাণীই সে বহন করে আনে। পাকা ধানের ডগায় সোনালি রোদ গলে গলে পড়ে। চকচক করে কৃষকের চোখ আনন্দে। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানের খেত দেখে কৃষক আশায় বুক বাঁধে। আর কিছুদিন পরেই ঘরে উঠবে সোনার ধান, পরম আদরের ধান। শরৎ তাই আগামী ফসলের সম্ভাবনার বাণী। মাঠে মাঠে নবজীবনের আশ্বাস। বর্ষায় যে বীজ বপন, হেমন্তে যে পাকা ফসলের পরিণত প্রতিশ্রুতি, শরতে তারই পরিচর্যা। অনাগত দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনায় তার নম্র নেত্রে খুশির ঝিলিক। এরই ওপর কৃষি প্রধান বাংলাদেশের আয়—ব্যয়ের হিসাব রচিত হয়। তাই অর্থনৈতিক প্রবাহে শরৎ ঋতুরও রয়েছে এক অপরিহার্য ভূমিকা।

জগতে কিছুই স্থায়ী নয়। শরতের প্রসন্ন বর্ণবৈভবও একদিন স্তিমিত হয়ে পড়ে। আনন্দমুখর উৎসব-সমারোহ থেমে যায়। কালচক্রের আবর্তনে শুধুই পট পরিবর্তন। এবার শরৎ বিদায়ের লগ্ন আসে এগিয়ে। শিশির বিছানো, শিউলি ঝরা পথের ওপর দিয়ে কখন সে নিঃশব্দে চলে গেছে। পথে পথে রেখে গেছে ঝরা শেফালি, বিষণ্ন কাশের গুচ্ছ আর মাঠভরা নতুন ধানের মঞ্জরি। সর্বত্রই উৎসব শেষের অশ্রুবিধুর আকুলতা। শরৎ যে আমাদের প্রাণের ঋতু! আমাদের প্রিয় ঋতু। এ ঋতুচক্রের মহিমায় বাংলাদেশ চিরকাল অপূর্ব সুখ, সৌন্দর্য ও শান্তির নিকেতন।

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

গ্রিন ব্যাংকিং

পরিবেশ রক্ষায় বাগান

সুফিয়া বেগম

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যাওয়া আজ সময়ের দাবি। দূষণমুক্ত একটি সুন্দর পৃথিবী পেতে আগামী প্রজন্ম ব্যাকুল হয়ে আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আজ পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের দিকে আমল দিয়েছে। আশার কথা যে, বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই।

ঢাকাসহ প্রতিটি শহর অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে উন্মুক্ত জায়গা, আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস, সেইসঙ্গে গাছপালার সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে শহরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ বিষয়ক এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, গ্রামের চেয়ে শহরের তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাড়ির ছাদে ও আঙিনায় যদি সবজি ও ফলের বাগান করা হয়, তবে তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি কমে যাবে।

শহুরে পরিবেশ রক্ষায় বাগান কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে 'গ্রিন ব্যাংকিং' কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্যাংক ঋণ এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে শাকসবজি এবং ফলমূলের চারা উৎপাদন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এলক্ষ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি সৌখিন বাগান মালিকদের সংগঠন 'গ্রিন রুফ মুভমেন্ট' সদস্যদের উৎপাদিত চারা বিক্রি করে থাকে।

গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করার ফলে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে 'গ্রিন সেন্ট্রাল ব্যাংক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাকে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। চর ও মঙ্গা এলাকার হতদরিদ্র ভুট্টা চাষিদের জীবন বদলে দিয়েছে গ্রিন ব্যাংকিং।

গ্রিন ব্যাংকিং-এর মতো কল্যাণধর্মী উদ্ভাবনী ব্যাপক ভিত্তিক কার্যক্রমের শুরুটা *সচিত্র বাংলাদেশ*কে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, যিনি ২০১১ সালের মাঝামাঝি থেকে গভর্নর থাকা পর্যন্ত গ্রিন ব্যাংকিং-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন এবং উষ্ণায়ন বৃদ্ধির কথা ভেবেই আমরা 'গ্রিন ব্যাংকিং' কার্যক্রম চালুর কথা ভেবেছিলাম। বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের বিনিয়োগ যাতে শিল্পবান্ধব হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে আমাদের। চারপাশের পরিবেশ সবুজ ও দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্য সামনে রেখেই গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রম চলছে।

ছাদে বাগান করা হলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কীটপতঙ্গ গাছের ফুলে ও ফলে বসে। এতে জীববৈচিত্র্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয় এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে। পাখি ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে সবজি ও ফল-ফলাদি রক্ষা করে। ঢাকা শহরের দালানকোঠাকে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বলেন–'দালানের বস্তি'। শহর এলাকায় বনায়ন ও বৃক্ষ রোপণের সুযোগ নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে ছাদ ও বাড়ির আঙিনাই ভরসা। 'বিল্ডিং কোড' মেনে যদি ভবন নির্মিত হয় তবে বায়ুদূষণ কিছুটা কমবে। ভবনের প্রতিটি তলা এবং ছাদ সবজি ও ফল বাগান করার উপযোগী করে নির্মাণ করা প্রয়োজন।

ঢাকায় 'বাংলাদেশ গ্রিন রুফ মুভমেন্ট' নামে সৌখিন ছাদ বাগান মালিকদের একটি সংগঠন ঢাকা শহরকে সবুজায়ন ও দূষণমুক্ত রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ১৫০ সদস্যের এই সংগঠন ছাদে ফল, ফুল ও সবজি বাগান করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আসছে।

নিবন্ধ

তাঁর জীবন জুড়ে কবিতার মায়া

[কবি শামসুর রাহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি]

সাইয়েদা ফাতিমা

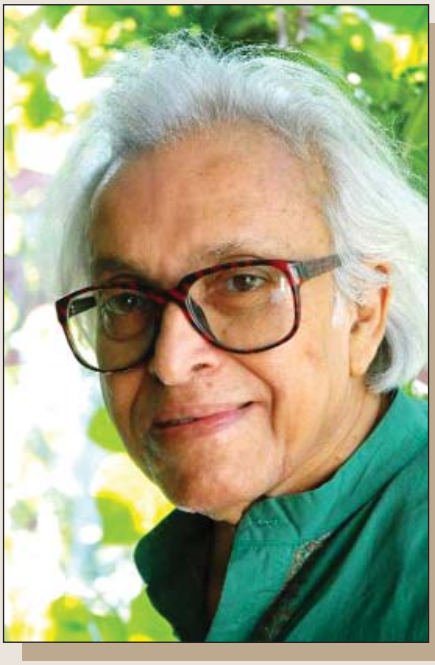

নাগরিক কবি শামসুর রাহমান বাংলা আধুনিক কবিতার প্রাণপুরুষ। মানবতার এই কবির হাতেই বাঙালি মুসলমানের কবিতা সত্যিকার অর্থে আধুনিক হয়ে ওঠে, যার ভুবন জুড়ে কবিতার মায়া। ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এই কবি। ঢাকার বনানী গোরস্তানে মায়ের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন তিনি।

সাহিত্যাঙ্গনে ষাটের দশকের শুরুতে এই কবির প্রতিভা আলোকিত হয়ে ওঠে সাহিত্যের ভুবনে। 'উনিশশ উনপঞ্চাশ' রচনার মাধ্যমে কবিতার ভুবনে নিজের জায়গা করে নেন শামসুর রাহমান। কবিতাটি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *সোনার বাংলা* পত্রিকায়। শুরুতে কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় অস্তিত্ববাদী ইউরোপীয় আধুনিকতা লক্ষণীয় হলেও পরে দেশজ সুর ও ঐতিহ্যকে তাঁর কবিতায় তিনি ধারণ করেন।

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*। প্রথম কাব্যগ্রন্থ সাহিত্য মহলে ব্যাপক আলোড়িত হয়। এছাড়া *রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, নিরালোকে দিব্যরথ, নিজ বাসভূমে* স্বাধীনতা উত্তরকালে কবির অন্যতম কাব্যগ্রন্থ। কবির কাব্য ভাবনায় আধুনিকতা, শিল্পবোধ, মিথ, প্রেম, চিত্রকলা সাহিত্যের বোদ্ধা পাঠককে আলোড়িত করে। আমাদের প্রতিটি আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। আমাদের গণতন্ত্রে, স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা কবিকে পাশে পেয়েছি। কবির হৃদয় যেন বাংলাদেশের পতাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান। ১৭ আগস্ট তাঁর দশম মৃত্যুবার্ষিকী। পুরান ঢাকার মাহুতটুলীতে ১৯২৯ সালে ২৩ অক্টোবর তাঁর জন্ম। 'স্বাধীনতা তুমি', 'তোমাকে পাবার জন্য হে স্বাধীনতা'সহ গুচ্ছগুচ্ছ মুক্তিযুদ্ধের কবিতা নিয়ে দেশ স্বাধীন হবার পর প্রকাশ পায় তাঁর সাড়া জাগানো কাব্যগ্রন্থ *বন্দি শিবির থেকে*। মোট ষাটটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। প্রতিটি গ্রন্থেই জীবন, কবিতা ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার এক চিরকালের কবিকে পাই আমরা।

পাকিস্তান আমলে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থানে এবং দেশ স্বাধীন হবার পরে যে-কোনো অসংগতিতে কবি অস্ত্র হিসেবে কলমকে বেছে নেন। রচনা করেন অনবদ্য সব কবিতা। বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, কাক, গেরিলা, হাতির শুঁড়, সফেদ পাঞ্জাবি ইত্যাদি কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে গণমানুষের কণ্ঠধ্বনি। তাঁর 'আসাদের সার্ট' কবিতাটি গণসচেতনতার মাইলফলক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন কারাগারে তখন তাঁকে নিয়ে লেখা কবিতা 'টেলেমেকাস' এবং সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লিখেছেন, 'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ' ও 'ইকারুসের আকাশ' কবিতা। যুদ্ধ অপরাধীরা যখন এদেশে উচ্চপদে আসীন হয়, তখন ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে তাঁর কবিতায়। 'একটি মোনাজাতের খসড়া', 'ফুঁসে উঠা ফতোয়া' সেসময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী কবিতা। গণতন্ত্রের জন্য লড়াকু সৈনিক শহিদ নূর হোসেনকে উৎসর্গ করে রচনা করেন 'বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়।'

কবি শামসুর রাহমান সত্যিকার অর্থেই একজন সমকালের কাব্য ভাষ্যকার। প্রেম, মৃত্যু, সংগ্রাম, চিরকালীন শৈল্পিক ব্যঞ্জনা তাঁর কাব্যের অনুষঙ্গ। মাতাল ঋত্বিক, ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই, আদিঅন্ত নগ্ন পদধ্বনি, এক ধরনের অহংকার, আমি অনাহারী, একফোঁটা কেমন অনল, টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে, ঝর্ণা আমার আঙুলে– এমনি অগণিত পাঠকপ্রিয় কবিতার জনক শামসুর রাহমান।

নগর জীবনকে ভালোবেসে ছিলেন কবি। লিখেছেন গদ্যগ্রন্থ স্মৃতির শহর। কালের ধুলোয় লেখা তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ। 'তোমার কবিতার কাছে' শিরোনামে কবি লিখেছেন– আমার কবিতা এই শহরে দেয়াল ভেদ করে/ উড়ে যায় ফ্যাক্টরির চোঙে/ আমার কবিতা অন্ধকারে শিস দেয় ফুটপাতে/ আমার কবিতা মৃত্যু পথযাত্রীর অধর থেকে/ অত্যন্ত রহস্যময় অনুভূতি ছেঁকে আনে/ আমার কবিতা দ্রুত নিউজপ্রিন্টকে অলৌকিক/ ব্যানার বানায়/ পাখিও কখনো/ আমার কবিতা গোরস্তানে চুমু খায় সাবলীল।

ছোটোবোন নেহারের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠতে ছোটোবেলায় কলম ধরেছিলেন কবি। লিখে গেছেন মৃত্যু অবধি। নিভৃতচারী ও রোমান্টিক এই কবি কবিতার পাশাপাশি সাংবাদিকতা পেশায় দীর্ঘ সময় কাটান। পঞ্চাশের দশকে মনিং নিউজ পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। দৈনিক বাংলায় দীর্ঘদিন তিনি কর্মরত ছিলেন।

অগণিত বাঙালি পাঠকের প্রিয় কবি শামসুর রাহমান বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য একুশে পদক, স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হন। কবি বাঙালির যে-কোনো সংকটে, আনন্দ ও বেদনায় আমাদের দিয়েছেন নতুন পথের দিশা। বাঙালির স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্বের গৌরবগাথা যতদিন থাকবে, কবি শামসুর রাহমান আমাদের মাঝে চির অম্লান থাকবেন ততদিন।

সরল সোজা

শাহরিয়ার নূরী

বুঝতে পারার ক্ষমতা মানে
বহন করার যোগ্যতা
বহন করার ক্ষমতা মানে
উজান ঠেলা নিরন্তর

বুঝতে পারা মানে
দুঃখ চেনা-জানা
দুঃখ চেনা মানে
নীলে ভাসা যে-মন
সিন্দাবাদ দৈত্যটাকে সময় পেড়ে ফেলে
স্মৃতি বাঁচে তাকেসহ দীর্ঘ কত জীবন
কেন বুঝতে চাও

সে বোঝে বলে আমি থাকি বড়ো বেশি তার ভাবনায়
সে বোঝে বলে তাকে যেন চেনা-জানা বড়ো এক দায়
সময়ের মায়া টানে আমি একা যদি থাকি এই কোণে
কেউ নয় একা কোনোকালে যে মনে থাকে দুজনে।

হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে আজ শোকের সানাই

নাহার আহমেদ

সেদিন ভোরের পাখিদের কোলাহল কেউ শোনেনি
শুনতে পায়নি সুরের বন্দনা
কিন্তু শুনেছিল প্রচণ্ড গর্জন কামানের
বুক ঝাঁঝরা করার নিষ্ঠুর আর্তনাদ
আততায়ীদের উল্লাসে সেদিন থমকে গিয়েছিল
ভোরের বাতাস।
সূর্য উঠাও হয়ত
হত্যাযজ্ঞের নায়করা রেখে গেল
নির্দয় আর নির্মমতার স্বাক্ষর।
বত্রিশ নম্বরের সেই বাড়িটার অন্দরমহলে
কলঙ্কিত করে গেল স্বাধীনতার পবিত্রতাকে
সাত কোটি বাঙালির পথপ্রদর্শক, আদর্শের প্রতীক
রক্ত পিপাসু শকুনের থাবায় ক্ষতবিক্ষত হলো।
জাতি নির্বাক, প্রতিবাদের ভাষা সেদিন হারিয়ে ফেলেছিল
ইতিহাসের কুঠারে দ্বিখণ্ডিত করা হোক, সভ্যতাকে
রক্তের সিঁড়ি বেয়ে সে যেন আজ ক্লান্ত।
নিহত গোলাপের শোকে মুহ্যমান বাঙালি জাতি
পাপড়ির আর্তনাদে হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে
শোকের সানাই।
রক্তের কালিতে লেখা হলো নৃশংসতার অভিধান।
জাতির জনকের রক্তাক্ত নিথর দেহটা
ইতিহাস লিখে গেল মীরজাফরদের,
তার প্রতিটা রক্তকণায়।
যার যন্ত্রণার ভার বহন করবে
বাংলার এই মাটি, অনন্তকাল ধরে।

রক্ত কলমের টানে

মাসুদুর রহমান

রক্ত কলমের টানে
রক্ত লাল এই কবিতা জানি তোমাকে আর ছুবে না
স্বপ্ন মুকুলের বনে
শুভ্র সাদা এই কবিতা জানি তোমাকে আর পাবে না
হঠাৎ হৃদয়ে রক্তক্ষরণে আজ বুঝতে পারি
রক্ত কলমের টানেই কবিতা লেখা যায়।

তোমার অন্ধ আয়োজনে হে কবি
সারি সারি কৃষ্ণচূড়া আর দেবদারু
রাতের এই আঁধারে
প্রিয় ক্রীড়াভূমে আজ জবুথবু মূর্তিমান
একাডেমিক ব্লকের খোলা জানালায় গড়ায় শ্রাবণের অশ্রুবিন্দু
কেমন আছে এই গভীর রাতে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ?
শূন্য থিয়েটারে এখনো মঞ্চস্থ হয় কি ইবলিশ, ওরা কদম আলী?
দেয়াল পত্রিকা আজ শব্দহারা
বর্ণমালা বড়ো বিবর্ণ হায়
বিতর্কের রথে চড়ে শব্দমালার বিজয় থেমে গেছে বহু দিন
তোমার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় বলেই
আজও পায়ে পায়ে আমরা লুকোচুরি করি গোধূলির ছটায়
খেলি মেঘ বৃষ্টি রোদ ঝড়।

সমীরণে যে শিহরণ
একটি বৃষ্টির জন্য যে প্রতীক্ষা
কিম্বা একটি ঝড়ের জন্য যে কী প্রবল অপেক্ষা
শিখতে শিখতে কখন যে কবিতা লেখা শুরু করেছি
হৃদয়ের অনবধানে বুঝিনি যে তুমি ছিলে তার মর্মমূল
রক্ত কলমের টানে আজ তাই লিখে যেতে চাই
হে কবি তোমার স্বপ্ন আয়োজনের জয়গান।

অনুভবের কৃষ্ণচূড়া

জাকির হোসেন চৌধুরী

বুকের জমিনে স্মৃতিবৃক্ষরা অস্তিত্বের শেকড় গাড়ে
তবু বিষণ্নতার ঝড়ে শাখা-প্রশাখা ধরেছে যেন আকাশে মেলে
আহত আঙিনায় ঝরাপাতার মর্মর সুরও প্রতিধ্বনি তোলে
অপ্রতিরোধ্য গতিতে সমান তালে অবিরাম ভেঙে চলে ভেতর বাহির
আগের মতো অনুভবের কৃষ্ণচূড়া বাইরে ফোটে না তার ফাগুন স্বভাবে।

জীবনের এই জলসা ঘরে অতিথি শ্রাবণের নগ্ন নৃত্য
মৃৎশিল্পীরাও জানে ভাঙাগড়ায় নিত্য নির্মাণের অন্তহীন সুখ

স্বপ্নের সিঁড়িতে রোদ বোধের কাচ ভেঙে গ্রিল ছুঁয়ে যায়
ব্যস্ততম দিনগুলো যাযাবর সময়ের হাত ধরে হেঁটে যায়
দুর্ভেদ্য আঁধারঘেরা রাত্রির মোহনায়
দিবস আর রাত্রির অমীমাংসিত চলমান বিরোধ
হায়েনার হিংস্রতায় ছিন্নভিন্ন করে আতুড় ঘরের স্বপ্নসুখ।

পথ চলা অবিরাম থামে না কখনো

আমিরুল হক

পা বাড়ালেই পথ
যে পথ কোটি মানুষের পদচারণা
জীবনের অন্বেষণে ধাবমান
হাজারো মানুষের আনাগোনা।
অথচ ভীত সন্ত্রস্ত আমি—
জীবনের ঝুঁকি সারাক্ষণ উঁকি দেয়
আমার মনে।

মৃত্যুকে নিত্য সঙ্গী করে পথ চলি
ভয়ের কাঁটাতারে বিদ্ধ হয় প্রাণ
কখনো যদি বিষাদের ছায়া নেমে আসে,
পথ চলা সেখানেই হবে শেষ।
রাজপথে চলন্ত যানবাহনগুলোর
নিয়ম শৃঙ্খলার বালাই নেই,
উশৃঙ্খল অবতারণায় মেতে ওঠে
বাস, ট্রাক, অটোরিকশা কোস্টার।
স্টিয়ারিং হাতে বেপরোয়া চালকের
অস্থিরতায় অজস্র জীবনে বয়ে আনে
অশনিসংকেত।

যন্ত্রদানবের তলায় প্রতিদিন পিষ্ঠ হয়
হাজারো প্রাণ।
নিহত হয় তরতাজা কিছু জীবন,
রক্তমাখা ঠিকানা বিহীন লাশ হয়ে পড়ে থাকে
পথের মোড়ে।
তবুওতো পথিকের পথ চলা অবিরাম
থামে না কখনো।

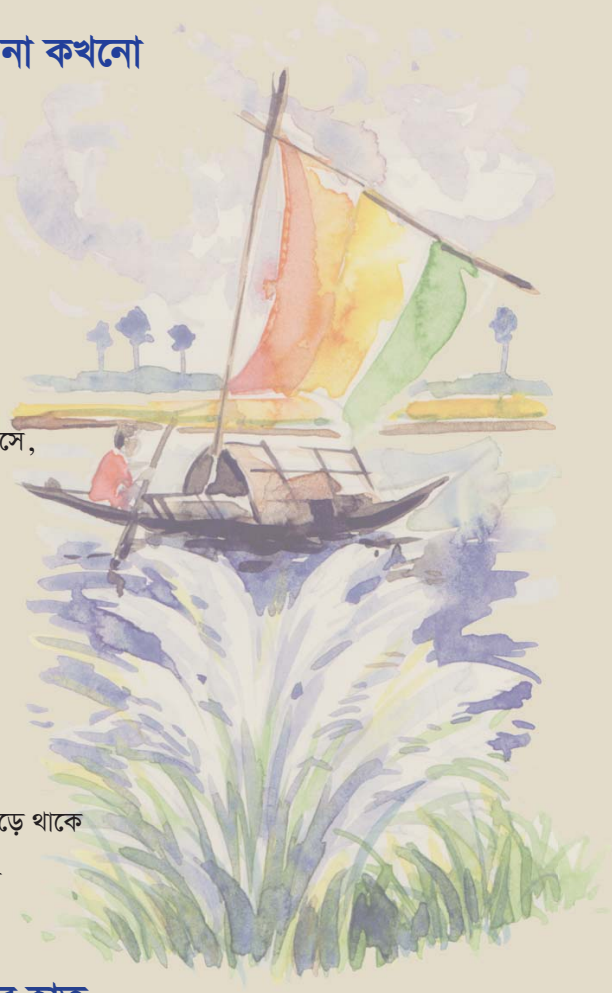

শরৎ ছবি

আহসানুল হক

পেঁজা তুলোর সাদা মেঘ
শিউলি ফুলের হাসি
শরৎ কালের দৃশ্য এমন
দারুণ ভালোবাসি !

নদীর জলে আকাশ ছবি
খালের পাড়ে কাশ
সুর বেঁধে যায় বাউল কবি
হয়ে যে উদাস !

দূর গগনে যায় যে উড়ে
ধবল বকের ছা
শরৎ শোভায় মুখরিত
'হাল্‌দা' পাড়ের গাঁ !

বাঁশ বাগানে পাতার ফাঁকে
মন ভোলানো চাঁদ
জ্যোৎস্না বিলায় রাত্রি জুড়ে
ভাঙে খুশির বাঁধ !

শব্দ রেখায় আঁকছি আমি
শরৎ ছবি আজ
শরৎ এলে প্রকৃতিও
নেয় যে নতুন সাজ !

কুয়োতলায় বাসন মাজার হাত

লিলি হক

আজকাল লেখার ডায়েরিটা অভিমানে মুখ লুকিয়ে থাকে,
আমার আদর ছাড়া বড়ো দুঃখ ভরা দিন কাটে তার,
যে হাত কবিতার পাখিদের শস্যদানা কুড়িয়ে দিত
সে হাত বইয়ের উলটো বাধাই হিসেব করে মুদি দোকান
আর সবজিওয়ালার মুখোমুখি সকলে অতি সন্তর্পণে
সার্ভিস চার্জ আর পত্রিকার বিল মেটানোর তারিখটা
এক সপ্তাহ পেছানোর।

হায়রে নিয়তি! কবিতা প্রেমিক কবির খেরোখাতায়
কী ডাকাতি, কোথায় কবিতা উৎসবে কবিতা পড়া,
শহিদমিনারে আবৃত্তি, বাংলা একাডেমির লেখককুঞ্জে
কুশল সংলাপ, যখন তখন প্রবাসী কবিদের ফাই ফরমাস
খাটা, চ্যানেলগুলোতে কারটা কত মিনিট দেখানো গেল!

স্টল ডিসপ্লেতে কোন বইটা উপরে আর কোনটা বইয়ের
সমুদ্রে ডুবসাঁতার কান্নার মুক্ত হাসি হয়ে ঝরে, বইমেলা
বকুল হয়ে আসে না কবিতার ঘরে, লেনদেন চুকিয়ে
হৃদয়ের উঠোনে ঘাসফুল হয়ে ফুটে 'চয়ন' বিজয় দিবস,
'দশদিগন্ত' শহিদ দিবস, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্যুভেনি'র
২০ এপ্রিল কার্ড বিলি বিজ্ঞাপনের চোখ রাঙানি,
হায়রে জীবন! কুয়োতলায় বাসন মাজার হাত,
এখন প্রচণ্ড ব্যথায় নীল।

দেশের মাটি ছুঁয়ে

গোলাম নবী পান্না

আসুন সবে দেশকে ভালোবাসি,
দেশের কাজে থাকি পাশাপাশি।

সবার মুখে সুখের মিষ্টি হাসি—
ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বে রাশি রাশি।

দেশটা প্রিয় প্রাণের হয়ে উঠুক,
দেশ গড়ারই কাজে সবাই ছুটুক।

বাগানজুড়ে নানান ফুল ফুটুক
নিশ্বাসে চাই সুগন্ধটাই জুটুক।

সবুজ ঘেরা ঘাস-বিছানায় শুয়ে—
শিশির ছোঁয়ায় শরীরটা নিই ধুয়ে।
পবিত্র এই দেশের মাটি ছুঁয়ে—
ধন্য হই অন্ন দানা রুয়ে।

হলুদ জবার নৃত্য

শাহজাদী আঞ্জুমান আরা

আজকে হলুদ জবা ফুটেছিল মাঠজুড়ে
বীম ছুঁয়ে তার নৃত্যে থমকে দাঁড়ায় উদয় শংকর
ভেঙে যায় অলস সকাল
নির্মেদ, নিভাঁজ গাঁথুনিতে

এভাবেই কি ফুটবে জবা প্রতিদিন
এভাবেই বীম নৃত্যে ভেঙে যাবে অলস সকাল
দুলে উঠবে ভেতরে না জানি সে কার?

কেবলই আশা ধরে রাখো

রুহুল গনি জ্যোতি

আমার প্রতিটি অক্ষরে তুমি জেগে আছো
জেগে আছো অষ্টপ্রহর চেতনার কালি ও কলমে
কখনো স্নিগ্ধ নদী কখনো বা ঝরনা হয়ে
অবিরাম চলেছে ছুটে অনন্ত দিগন্তে, এলোমেলো
কখনো খুব কাছাকাছি কখনো বা দূরে বহুদূর
হৃদয়ে তোমারই সুর বাজে কখনো বিষণ্ন নূপুর
ধ্বনি যেন বা দুঃখ হয়ে ঝরে কেবলই ঝরাপাতা
সঙ্গীহীন বিমুখ প্রান্তরে–তবু জেগে থাকো তুমি
চেতনার অণু-পরমাণুতে ছড়াও কিসের নেশা
জীবন জাগার গানে– কেবলই আশা ধরে রাখো
কেবলই প্রেরণা দিয়ে যাও।

তুমি বিষয়ক মিশ্র প্রতিক্রিয়া

কামাল হোসাইন

অদ্ভুত এক আবেগে ভেসে যাই ইদানিং;
তোমার কাছে যাবার যে প্রাবল্য
তোমাকে একান্ত করে পাবার যে মধুভাবনা
অদ্ভুত আবেগটা ঠিক সেখান থেকেই।

তবু কেন যেন ঠিক তোমাকে ছুঁতে পারি না
ভাবতে পারি না সেই প্রথম দিনের মতো করে।
সেদিনের সেই স্পন্দিত শরীর, কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটযুগল...
বাহুবন্ধনে কী এক মাদকতা এনেছিল শরীর ও মনের গহীনে...
তারপর তরঙ্গমালায় উত্থান-পতন, ঝড়-ঝঞ্ঝা
তুমুল জলোচ্ছ্বাস আর কল্পনার ডুবসাঁতারে
জলকেলির মিশ্র অনুভব।

তবু সেই অন্তর্দহন থেকে ঠিক বেরুতে পারি না হায়...
তুমিবিষয়ক যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া, তার অবসান হল না আজো।

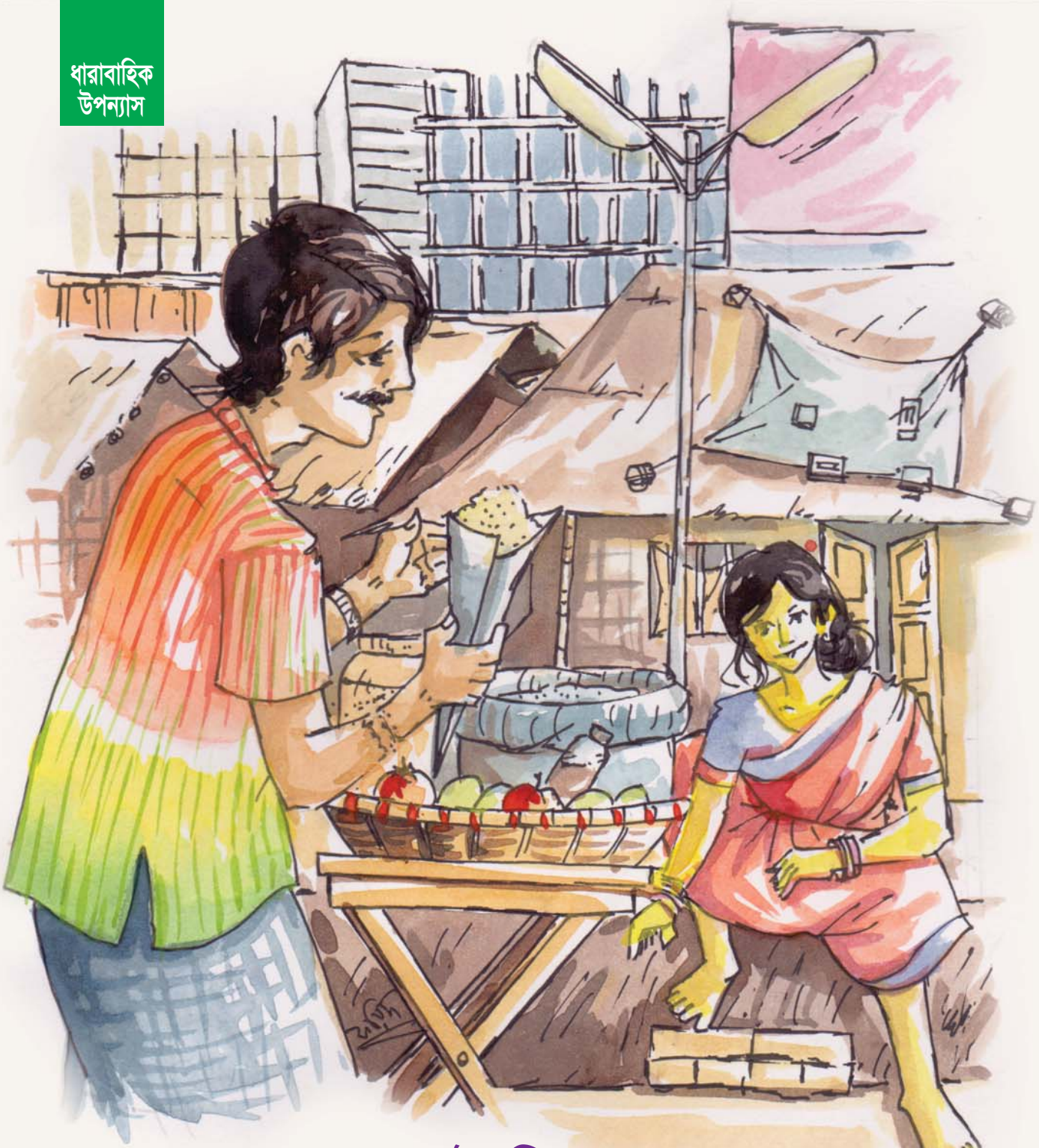

ভ্রষ্ট বিলাস

সাগরিকা নাসরিন

মাগরিবের জন্য বেরিয়ে পরলে তাকে ধরা একটু কঠিন আছে। সাজিদকে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে সোজা রাস্তা ধরে তিনি হাঁটতে শুরু করেন। তারপর প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কিছু খরিদ খরচা করেন। ফল-ফলাদি, সবজি-পান। মালার ছোটো খাটো ফাইফরমাশ। এ সময় জিনিসপত্রের দামে সকালের মতো এত উত্তাপ থাকে না। কেনাকাটা করে আলাদা আরাম আছে। এ জাতীয় আরাম ছিল তার প্রথম জীবনে। পদ্মপাতায় মুড়ে আনা সদাইপাতি পেয়ে অভিভূত হয়ে যেতেন প্রথম স্ত্রী সাকিবুন নাহার। অল্পতেই তুষ্ট হওয়া মানুষ। তাই প্রাচুর্যতা বেশি দিন ধরে রাখতে পারল না তাকে। সংসার যখন জাগল। তিনি জাগলেন না। কপালে সবার নাকি সুখ সয় না। ভয়ংকর জ্বরের কবলে পড়ে সংসার, সন্তান, স্বামী সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলেন মহাশূন্যের দেশে। এরপর

বহুদিন একাকী নিঃসঙ্গ জীবন ছিল শেকাবুর সাহেবের। অবশেষে ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে তার একাকিত্বে বাধ সাধল।

তারপর আমূল বদলে গেলেন শেকাবুর সাহেব। জীবনের সাথে তার কিছু শখও যোগ হয়েছে। কেনাকাটা তার মধ্যে একটি। সে শখ পূরণ করতে ঘুঘু চরানো মহিলাদের মতো শপিং সেন্টারে সারাবেলা ঘুর ঘুর করতে হয় না তাকে। ফুটপাতই যথেষ্ট। কেনাকাটার সাথে সাথে এখানে গল্পগুজবও জমে। সবার হাঁড়ির খবর পান। কার বউ টিভিতে সুলতান সুলেমান দেখতে না পেয়ে মোবাইল ছুঁড়ে মেরেছে কপালে, কার ছেলে রোজ একটা করে আইসক্রিম না দিলে স্কুলে যায় না, কাজের কথা বললে কার মেয়ের গায়ে একশ দশ ডিগ্রি জ্বর আসে ,কার শালা-বউ প্রবাসী স্বামীর টাকা ফূর্তি করে উড়িয়ে বেড়াচ্ছে, চিকিৎসা না পেয়ে কে বিনা ঘুমে রাত্রি যাপন করছে। এসব খবর শেকাবুর সাহেবকে না জানালে অনেকের পেটে হজমের ভারি গোলমাল হয়।

সেই সূত্রে পারুলের অসুস্থতার খবর তিনি জানতেন। জিয়ারত মিয়া এসে যে-কোনো সময় তার পায়ের উপর হামলে পরবে, সে অনুমান কেবল তার কেন, মালারও ছিল। চার দেয়ালে বন্দি হলেও পাড়ার অনেক খবর মালার কাছে আপনিই এসে পরে।

জয়নব এসেও মালাকে ধরল। শেকাবুর সাহেব মাগরিবের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মালা সামনে এসে দাঁড়াল।

– জয়নব আসছে।

– জয়নবটা আবার কে?

– জিয়ারত সাবের মেয়ে।

– জিয়ারতকে সাব বলতেছ কেন?

– বয়সে অনেক বড়ো।

– তাতে কী? তুমি আমার বউ। সেই রাবিতে সবাইরে ডাকবা।

– ঠিক আছে ডাকব। এখন জয়নবরে কী বলবো? মেয়েটা কানতেছে। মায় হাসপাতালে পইড়া রইছে। আর বাপেরে খুঁইজা পাইতেছে না।

– জিয়ারত যাইবো কই ? আছে কোনোখানে পইড়া।

– বউয়ের এমন নিদানকালে কই পইড়া থাকব? লোকটার কোনো হুঁশ-জ্ঞান নাই?

-হুঁশ থাকলেতো হইতোই। এরা বউ বোজে, না বাচ্চা বোজে! অর লগে মোবাইল নাই?

- মোবাইল নাকি সাথে নেয় নাই। হাসপাতালে রাইখা আসছে।

– তাইলেতো মনে হয়, ইচ্ছা কইরা পলান দিছে। এইসব অসুখ-বিসুখ-ঝামেলা অনেক পুরুষের আবার পছন্দ না। হেরা খালি নিজের আরামটাই বোজে। বিপদের দিনে তাগো ছায়াও দেখবা না।

– কেমন স্বার্থপর!

– স্বার্থপরের কী দেখছো? অগোরে চিন্তে তোমার আরো সময় লাগবে। অরা পারে না এমন কিছু নাই। আমি নীচতলায় এত শক্ত কইরা দামি কলাপসিবল গেইট লাগাইছি, তুমি কি মনে করছ, এমনি এমনি? অগোরে বিশ্বাস নাই।

লাগাম না টানলে কথায় বিরতি দেওয়া শেকাবুর সাহেবের কাজ না। ইদানীং তা বেড়েছে বহুগুণ। তাই সুঁতো ছিড়তে হলো মালাকেই।

– এখন জয়নবকে কী বলব, সেটা বলেন। মেয়েটাতো কখনো আসে না। আইসাই কান্না শুরু করছে। এমন বিপদে বউ-বাচ্চা ফালাইয়া কেউ পলান দেয়! এমন পাষণ্ডও হয়! একটু অবাকই হয়েছি আমি।

শেকাবুর সাহেব অবশ্য অবাক হলেন না। জয়নবকে পাঠানো জিয়ারতের কোনো কৌশলও হতে পারে। তবে বুদ্ধি-কৌশল যাই হোক শেকাবুর সাহেব তার কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন। পারুলের চিকিৎসা আগে হোক। জিয়ারতের সন্ধান পরে। তার সন্ধান না মিললেও চলে। সংসারের জন্য অপরিহার্য ব্যক্তি সে নয়। ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে মালমসলা বিক্রি করা ছাড়া জিয়ারত কোনো কাজে আসে না। তার আচার-আচরণও এমন মধুর নয় যে, তার নিরুদ্দেশে কেউ তার জন্য হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবে। জয়নবও তাকে বেশি পছন্দ করে বলে মনে হয় না। বাবার বুদ্ধি বিবেকের ঘাটতির খবর নিশ্চয়ই তার অজানা নয়।

বুদ্ধি-বিবেকহীন মানুষ শেকাবুর সাহেব পছন্দ করেন না। তার দুই ছেলেরই বুদ্ধি বিবেকের বালাই নেই। তাই তাদেরকে আলাদা ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া হয়েছে। ছোটো ছেলের বউটা অবশ্য অন্যরকম। একটু অস্থির প্রকৃতির। তবে মন ভালো। বয়সে প্রায় সমান হলেও সৎ শাশুড়ি মালাকে সে যথেষ্ট খাতির করে।

মালা অবশ্য খাতিরযত্ন পাওয়ার মতো মেয়ে। এমন ভালো মেয়ে জীবনে খুব কম দেখেছেন শেকাবুর সাহেব। বয়সের এতটা তফাত নিয়েও মালাকে নিয়ে তিনি অনেক সুখে আছেন। মালার কাছ থেকেই তিনি মানুষের জন্য করার তাগিদটা অনুভব করেন। দানে সম্পদ বাড়ে। দাতা কখনো ফতুর হয় না। গ্রহীতা দানের কথা ভুলে যেতে পারে, অস্বীকার, এমনকি প্রতারণাও করতে পারে। তাতে কিছু যায় আসে না। দানের সাথে দাতার সম্পর্ক। গ্রহীতার নয়। দানেই দাতা মহান হয়ে যায়।

এসব কথা মালা কোত্থেকে শিখেছে, কে জানে। গরিবের মেয়ে হয়েও তার মনের এই বৃহদায়তন ভালো লাগে শেকাবুর সাহেবের। দ্বিতীয় বিয়ের ইচ্ছে ছিল না তার। এখন মনে হয়, জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও জীবন কখনো কখনো অনেক অর্থবহুল হয়।

হাতের চেটোতে আতর ঘষলেন শেকাবুর সাহেব। এ আতরটা একটু অন্যরকম। ঠিক মোল্লাদের কম দামি উদ্ভট গন্ধের আতরের মতো নয়। মালার পছন্দের আতরের একটা মিষ্টি গন্ধ আছে। বিদেশি পারফিউমের কাছাকাছি গন্ধটা। আতরের সাথে সাথে মনটাও সুগন্ধিতে পূর্ণ হয়ে যায় শেকাবুর সাহেবের। পিট পিট করে আড়ে আড়ে তিনি মালাকে দেখতে থাকেন। শ্যামলা মেয়ে মালার চেহারায় অসাধারণ লাবণ্য আছে। মিষ্টি চেহারার সাথে স্নিগ্ধ হাসির মিশেল অতুলনীয় করে তোলে মালাকে। হাঁটু পর্যন্ত গড়িয়ে পড়া কুচকুচে কালো চুলে মাঝে মাঝে ওকে অপ্সরীর মতো লাগে। সৌন্দর্যের পিছনে মানুষের আচার-আচরণের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। স্বভাব সুন্দর বলে কি ও আরো বেশি মোহময়?

প্রায় সময়ই মালার দিক থেকে চোখ ফেরাতে সময় নেন শেকাবুর সাহেব। এ বয়সেও মনটা তার সবুজ কচি লাউয়ের ডগার মতো ধেড়ে এদিক সেদিক বেড়ে চলছে। আসলেই কি মানুষের বয়স কেবল শরীরে বাড়ে? মন কি আজীবন লাগামহীন দুরন্ত বাচ্চা ঘোড়া? তা না হলে মাঝে মাঝে আজকাল কেন তার ঝুম বৃষ্টিতে খোলা রিকশায় চড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে? ভিজে চুপচুপে হয়ে বাসায় ফিরতে সাধ জাগে? গুনগুন করে গান গাইতে ভালো লাগে। তার সেই পুরনো বেলার গান-

মধুমালতী ডাকে আয়....ভরা ফাগুনের এ খেলায়...।

ইদানীং তিনি এফ.এম রেডিও শোনেন। কানে হেডফোন লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন। এক সময় রেডিওতে বাংলা ছায়াছবির

গান খুব জনপ্রিয় ছিল। সেই সময়ে অনেকবার রেডিওতে মধুমালা নাটক শুনেছিলেন তিনি। মধুমালা-মদন কুমার। স্বপ্নে দেখা মধুমালার জন্য কী আকুতি মদন কুমারের! আনমনে মদন কুমারের মতো গানও ধরেন শেকাবুর সাহেব-

আমি স্বপ্নে দেখলাম মধুমালার মুখরে...।

স্বপ্ন যদি মিথ্যে গো হইতো, আংটি কেন বদল হইলোরে...!

মধুমালা নাটক প্রচারের জন্য বাংলাদেশ বেতারে অনুরোধও পাঠিয়েছিলেন শেকাবুর সাহেব। বেতার অনুরোধ রাখে না। দর্শক চাহিদার ধারকাছ দিয়েও হাঁটে না। এরা অনুরোধের গল্প বানিয়ে বানিয়ে বলে। টঙ্গি থেকে অনুরোধ পাঠিয়েছেন- টঙ্গা..মঙ্গা..জঙ্গা..। নোয়াখালির সোনাইমুড়ি থেকে অনুরোধ এসেছে সোনা মিয়ার।

সাজিদের গলার আওয়াজ পেয়ে হাতের কাজ দ্রুত শেষ করেন শেকাবুর সাহেব। বিভিন্ন অজুহাতে আজকাল চোখে সুরমা দেওয়াটা এড়িয়ে চলেন তিনি। কেন যেন তার ধারণা হয়েছে, মুখে কিছু না বললেও মালার সায় নেই এ কর্মে।

ট্যাঁকে টাকা গুঁজে রাখা শেকাবুর সাহেবের পুরোনো অভ্যাস। আগে লুঙ্গিতে গুঁজতেন। পায়জামা ধরার পর থেকে পায়জামায় গুঁজতে হয়। তবে লুঙ্গির শক্ত গিট্টুর ট্যাঁকে টাকা গুঁজে রাখার মজাটা আজো ভুলতে পারেননি তিনি। দেশ এগিয়ে গিয়ে যতই ডিজিটাল হোক, পান-সুপারি খাওয়া মানুষ কজনই বা পান–সুপারি ছেড়ে টুথ ব্রাশ দিয়ে ঘঁষেমেজে দাঁতের রং ফিরিয়েছে?

তাই সামাজিক–অর্থনৈতিক চাপে লুঙ্গি ছেড়ে প্যান্ট–পায়জামা ধরা মানুষগুলোর লুঙ্গির প্রতি আলাদা একটা দরদ আছে। যারা লুঙ্গিকে সভ্য পোশাক মনে করে না, তাদের সাথে লুঙ্গি প্রেমিকদের গোপন একটা দ্বন্দ আছে।

বসার ঘরে জয়নবের সাথে সাজিদের কথা বলাটা ভালো লাগল না মালার। ছেলেটা ইদানীং পাখা মেলতে শুরু করেছে। মেয়ে-ছেলে দেখলে আগ বাড়িয়ে কথা বলে। গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। নতুন করে আবার মোবাইল বায়না জুড়েছে। মালার ঘোর আপত্তি আছে তাতে। সে নিজেও মোবাইল ব্যবহার করে না। তার ধারণা, মোবাইল কিনে দিলে উচ্ছিন্নে যেতে আর কিছুরই প্রয়োজন পড়বে না তার।

রোজার ঈদের বখশিশের পয়সা দিয়ে সে জিন্সের প্যান্ট কিনেছে। সে প্যান্টের আবার চৌদ্দটা পকেট। অনেক জায়গায় রং জলা। ছেঁড়া-ফাটা। বিষয়টা মালা ধরিয়ে না দিলে চোখেই পড়ত না শেকাবুর সাহেবের। মালার চোখেই অনেক কিছু দেখেন তিনি। সাজিদের জিন্সের প্যান্ট দেখে বললেন, টাকা দিয়া মানুষ পুরানা প্যান্টও কিনে!

শেকাবুর সাহেবকে সাজিদের যুবক হয়ে ওঠার বিষয়টাও ধরিয়ে দিতে হয়েছিল মালাকেই। রুনির মার সাথে ইদানীং তার আলগা খাতির বেড়েছে। সময়ে-অসময়ে সে রান্নাঘরে ঢোকে। এটা-ওটা হাতের কাছে এগিয়ে দেয়। বেশি বেশি কেন রুনি এ বাসায় আসে না, এ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তা ভর করেছে সাজিদের মাথায়।

রুনির মা দেখতে ভালো না। কিন্তু মেয়েটা তার বেশ সুন্দর। চোখে না হেরে উপায় নেই। রূপই রূপ। বাচ্চা মেয়ের রূপও মারাত্মক হয়। রুনিকে দেখলে মালার মনটাও ভরে যায়। কেমন মায়াবি চাহনি। আদর আদর কথা বলা। ফাঁক পেলেই রুনির পিছনে লাগে সাজিদ। সেই আদর মাখা কথাগুলোকে ব্যঙ্গ করে বলে। এ নিয়ে মালাকে নালিশ করেছে রুনির মা। এরপর থেকে রুনির মাকে মাথায় তুলে রেখেছে সাজিদ। দ্বিতীয়বার মালার কাছে নালিশ সে কিছুতেই পৌঁছাতে দিবে না। সে সুযোগ পাওয়ার আগে প্রয়োজনে মেরে ফেলা হবে রুনির মাকে। মালাকে ভয় পায় সাজিদ গোখরা সাপের মতো। মান্য করে পীরের মতো।

মালাকে দেখে ছাতা খুঁজতে ব্যস্ত সাজিদকে অনেকটা অপরাধীর মতো লাগে। গত রাতে মালার প্রিয় বিড়াল রাইসাকে সে মাছ খেতে দেয়নি। সে কোন ফাঁকে মাছ খেয়ে ফেলেছে, রুনির মা দেখতে পায়নি। তবে মালা ঠিকই জানে, এ সাজিদের কাজ। রাইসার মাছ খাওয়া সাজিদের পছন্দ নয়। বিড়াল খাবে কাঁটা। হাড্ডি চুষবে। দুধের দিকে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকবে। বাঘের মাসির এত আদিখ্যেতা কেন!

ম্যাঁও ম্যাঁও করে মালার মন ভিজিয়েছে রাইসা। এর একটা ভালো রকমের বিহিতের অপেক্ষায় আছে সাজিদ। সুযোগ পেলেই সে রাইসাকে বস্তায় ভরে দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। যেখান থেকে পথ চিনে বাড়ি ফেরা রাইসার জন্য একেবারেই দুঃসাধ্য। তবে দৈবক্রমে জিয়ারত মিয়ার মতো হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা যদি রাইসার বেলায় ঘটে তো বেঁচে যায় সাজিদ।

মিষ্টি খেতে দেওয়া হয়েছিল জয়নবকে। একটির বেশি খেতে পারেনি। ঢক ঢক করে কেবল পানি খেয়েছে জয়নব। মায়ের জন্য দারুণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার।

সাজিদের হাতে ছাতা দেখে শেকাবুর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ছাতার যে একটা শিক বাঁকা খেয়াল করছোস?

– খালাম্মায় কইছিল, আরেকটা ছাতা বাইর কইরা দিব।

– খালাম্মায় আরেকটা ছাতা দিব কী দিব না, আমি তোরে হেইডা জিগাই নাই। জিগাইছি ছাতার শিক একটা বাঁকা এই খবর তোর কাছে আছে কিনা। যা জিগামু ডাইরেক্ট জবাব দিবি।

– জ্বি মামা।

– জ্বি মানে কী?

– শিকটা বাঁকা আমি জানি।

– কেমনে বাঁকা হইল?

– আমি রাইসারে দৌড়ানি দিছিলাম।

মালা দাঁড়িয়েছিল সামনে। শেকাবুর সাহেব জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, রাইসারে তুই মারছস?

– জ্বে না, মারি নাই। মারার ভয় দেখাইছি। দৌড়ানি দিছি।

– এতে শিক বাঁকা হইল কেমনে?

– ছাতার বাড়ি গিয়া পড়ছিল শক্ত দরজার উপর।

-অবুঝ পশুরে তুই ভয় দেখাছ? বাড়ি দেস?

– চিন্তা করছি, এসব আর করব না।

– না করলেই ভালো, তবে তোর উপর আমার কোনো বিশ্বাস নাই। আর দশটা বাঙালি যেমন, তুইও ঠিক তেমন। কথা কাজে মিল নাই।

– আপনি দেইখেন মামা।

– হইছে। এইবার যা... জাফররে গাড়ি বাইর করতে ক।

– কেন...হাঁটতে যাইবেন না? আমি না ছাতা বাইর করলাম।

– না হাঁটনের সময় নাই। হাসপাতালে যাইতে হইব।

শেকাবুর সাহেবের সিদ্ধান্তে খুশিতে মনটা মুহূর্তেই ভরে গেল মালার। জয়নবের মায়ের তাহলে অপারেশনটা হবে। জয়নবের কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেবল চোখ থেকে পানি পড়ছে টপ টপ।

মানুষের অসহায়ত্ব দেখার চেয়ে দশ তলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া অনেক সহজ। জিয়ারত মিয়া কেমন করে লাপাত্তা হয়ে গেল দিনে-দুপুরে। হাসপাতালে ব্যথায় কাতর বউটারে একবারও মানুষ মনে করল না! এতদিনের ঘরসংসারের কী কোনো মূল্য নেই!

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে বের হয়ে গেলেন শেকাবুর সাহেব। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব্ল্যাক ওয়াইন কালারের প্রাইভেট কারটার চলে যাওয়া দেখল মালা। ব্ল্যাক ওয়াইন কালার বেশ পছন্দ তার। তাই গাড়িটাও। তবে দেখতে যতটা ভালো লাগে, চড়তে ততটা না। খুব দরকার না হলে বাইরে বের হয় না সে। তেমন প্রয়োজনও পড়ে না। তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের যোগানদাতা শেকাবুর সাহেব। ছেলেমেয়েরাও দেয় মন চাইলে। কোনো কিছুতেই পছন্দ-অপছন্দ নেই বলে মালার জন্য কেনাকাটা করা খুব সহজ।

রাতের জন্য রুটি বানাতে ব্যস্ত রুনির মা। ছিমছাম রান্নাঘর। প্রতিরাতে রান্নাঘরটা একবার পরিদর্শন না করে ঘুমুতে যায় না মালা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে কোনো আপোশ করে না সে। এই একটিমাত্র কারণে রুনির মাকে সে কথা শোনায়। এ ভয়ে সন্ধ্যার আগে রান্নাঘর পরিষ্কার করে ফেলে রুনির মা। যত রকম পরিষ্কারক-পাউডার, সাবান আছে। সবগুলোর নাম রুনির মা টিভি দেখে মুখস্থ করে ফেলেছে।

মালাকে দেখে আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসতে থাকে রুনির মা। চা দিমু আপা?

– না থাক। এখন চা বানানোর দরকার নাই।

– না..না.. বানাইতে হইবো না। বানানোই আছে। মল্লিক সাবে খাইতে চাইছিল।

– তার খোঁজখবর ঠিকমতো নিচ্ছতো?

– যে আপা। তয় মানুষটা বেশি সুবিধার না। মহিলা দেখলেই খুক খুক কাশে।

– তার কাশির সমস্যা আছে। এজন্যইতো ডাক্তার দেখাইতে আসছে। তারে নিয়া তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নাই। যা চায় সাজিদরে দিয়া পাঠাইয়া দিবা।

– হ্যায়তো চা চাইতে পাকঘরে আইসা পরে। আমার পিছনে দাঁড়াইয়া খুক খুক করে।

– আমি তারে পাকঘরে আসতে নিষেধ কইরা দিব। তুমিও ঐদিকে যাবা না। যা পাঠানোর সাজিদকে দিয়া পাঠাইয়া দিবা।

– আর একটা কথা আপা, রানা চাচায় দুই কেজি গোশত ভুনা পাঠাইতে কইছে।

– পাঠাইয়া দাও।

– দুই কেজিতো নাই। সোয়া কেজির মতো আছে।

– আচ্ছা ঠিক আছে। বাকিটা আমি ওনারে ফোন কইরা আইনা দিতাছি।

রান্নাঘর থেকে বের হয়ে ডাইনিং এ ঢুকল মালা। বিশাল ঢাকনায় ঢাকা বড়ো বাটি ভরা নুডলস দেখে আবারো রান্নাঘরে ফিরে এল।

– কী ব্যাপার রুনির মা, এত নুডুলস টেবিলে পইড়া রইছে? জয়নবরে খালি মিষ্টি খাইতে দিলা। হয়তো সারারাইত মেয়েটা হাসপাতালে না খাইয়া থাকব।

– গরিবরা দুই-এক বেলা না খাইয়া থাকলে কিছু হয় না আপা।

– গরিব হইয়াও এই কথা বললা। নুডুলসতো নষ্ট কইরা ফালাইবা।

– নষ্ট হইব না আপা। সাজিদরে গরম কইরা দিলে ফিনিস কইরা ফালাইবো।

–কোনো কথায় তুমি ঠকতে চাও না। সাজিদ খাবে ঠিক আছে। জয়নবওতো খাইতে পারত। বাপটা ভাগছে। টাকাপয়সা আছে কি-না কে জানে। হাসপাতালের আশপাশে খাবারের কী দাম তুমি জানো? জানবা কেমনে? যেদিন নিজে হাসপাতালে যাবা। সেদিন জানবা।

– আমারে অভিশাপ দিয়েন না আপা।

– অভিশাপ খুব ভয় পাও না? যদি লাইগা যায়। তোমগো মতো মানুষ, যারা অন্যেরডা বোঝে না। অভিশাপ ছাড়া তাগোরে সায়েস্তা করা কঠিন।

বিষাদ ঝড়ে পড়লো মালার কণ্ঠে, আহারে মাইয়াডা রাইতে কই খাইবো? কী খাইবো?

বিষাদের পরে বিরক্ত হয় মালা। নিজের উপরেই। সে নিজে যদি জয়নবের আর একটু খোঁজখবর নিত, তাহলে এত খারাপ লাগত না। অবশ্য শেকাবুর সাহেবের উপস্থিতিতে কারো জন্য কিছু করার সুযোগ থাকে না বললেই চলে। মালাকে কারো জন্য কিছু করতে কখনো তিনি বারণ করেননি। আবার বাইরের মানুষজনের ব্যাপারে নাক গলানোর সুযোগও তিনি রাখেন না কোথাও। মালা অবশ্য এসব না বোঝা মেয়ে না। কোথায় থামতে হয়, মালাকে তা শিখিয়ে দিতে হয় না। তার গণ্ডি নির্ধারণ করে না দিলেও চলে। সিংহের মতো আপন সীমানার বাইরে সে বিচরণ করে না।

চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেল মালা। রুনির মা জিজ্ঞেস করল, চা কি খাইবেনই না?

– খাব না কেন?

– চা যে শরবত হইয়া গেল। আপনের কি শরীর খারাপ আপা?

– কেন? শরীর খারাপ হবে কেন?

– তাইলে কি মন খারাপ?

– মন...!

চায়ের কাপ হাতে ডাইনিং-এ এসে বসল মালা। মন খারাপ কিনা, বুঝতে চেষ্টা করল। মনের আস্তানা সে আজকাল খুঁজেই পায় না। কিছুক্ষণ মনের আস্তানা খুঁজে বেড়াতে লাগল। অনেক হাতড়ে বেড়িয়েও মনের আবাসস্থল খুঁজে পেল না। এখন কেউ যদি তাকে রিমান্ডে নিয়ে পিটিয়ে তক্তাও বানিয়ে ফেলে, সে মনের সন্ধান দিতে পারবে বলে মনে হয় না।

রাতে ফিরে শেকাবুর সাহেব জানালেন, জিয়ারত মিয়া এখনো ফিরেনি। তবে পারুলের ব্যথা অনেকটা সহনশীল পর্যায়ে এসেছে। অপারেশন দু-চারদিন পরে করলেও চলবে।

অপারেশনের টাকা কোত্থেকে আসবে, সে প্রশ্নে গেল না মালা। কেবল ভবিষ্যতের ভাবনা লাঘব করার স্বার্থে বলল, ওদের ভাগ্য যে, এ সময়ে আপনার মতো মানুষ ওদের পাশে আছে।

– কেন? আমি কী করছি?

– কী করেন নাই তাই বলেন। আপনি যে কষ্ট কইরা হাসপাতালে গেছেন, কষ্ট কইরা টাকাপয়সা দিছেন। কয়জনে এইটা করে।

এরপর কথাটা না তুলে পারলেন না শেকাবুর সাহেব রানা আমারে ফোন দিছিল। সে নাকি দুই কেজি গোশত ভুনা কইরা দিতে কইছিল। তোমরা দিছ এক কেজিরও কম।

মালাকে সুযোগ না দিয়ে রুনির মা বলল, বাসায় গোশত ছিল না। আপারে কইছিলাম আপনারে ফোন দিয়া কইতে। আপায় মনে হয় ভুইলা গেছে। পরে যা ছিল তাই রাইন্দা পাঠাইছি। তাতে তো এক কেজির কম হওয়ার কথা না।

শেকাবুর সাহেব বললেন, বন্যা-বনি-রানা-রাশেদের ব্যাপারে কোনো গাফিলতি করবা না। যা চায়, পাঠাইয়া দিবা।

এরপর বলার মতো কোনো ভাষা খুঁজে পেল না মালা। বিস্ময়ে প্লেটের ভাত খুঁটতে লাগল। দুই কেজি কেন, দশ কেজি দিতেও কার্পণ্য করে না সে। আজ একদিন ভুল হয়েছে বলে নালিশ চলে এল। নালিশ-অভিযোগ কত সহজে বহনযোগ্য শব্দ। আর প্রশংসা-ধন্যবাদ। এগুলো কী এমন শক্ত শব্দ, যে মুখ থেকে বের করতে অনেক কসরত করতে হয় জিহ্বাকে। বাঙালির জিহ্বা এত ভারি কেন!

বিদেশ ফেরত রানাইতো বলেছিল, বিদেশিরা প্রয়োজনে, প্রয়োজনের বাইরেও থ্যাঙ্ক ইউ, সরি বলে। তাহলে রানা বিদেশ থেকে কী শিখে এল। শেখার মানসিকতা তৈরি করতে বাঙালিকে আর কত হাজার বছর অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

শেকাবুর সাহেব ঘুমুতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত মালাকে অপেক্ষা করতে হলো। তারপর সে সাজিদকে দিয়ে চেইন সপ থেকে মাংস কিনে আনালো। প্রেসার কুকারে রান্না চড়িয়ে দিয়ে রুনির মাকে বলল, দশটা সিটি হইলে নামাইয়া ফেলবা। সাজিদরে বইলা রাখছি। ও গিয়া দিয়া আসবো।

– এত ঝামেলা না করলেও চলত আপা।

– চলত না। ভুলতো আমারই হইছে।

– তাই বইলা মিথ্যা কথা কইবো। এক কেজির কম গোশত। কিছুতেই হইতে পারে না।

– শোনো কথা বাড়াবা না। আন্দাজ কইরা কিছুই বলবা না।

ডাইনিং পেরিয়ে বসার ঘর লাগোয়া বারান্দায় গিয়ে সাজিদকে পাওয়া গেল। আশ্বস্থ হলো মালা। রাস্তার সোডিয়াম আলো এসে ঠিকরে পড়েছে ওর কোমল মুখের উপর। বেশ ফর্সা লাগছিল ওকে। তের-চৌদ্দ বছরের ছেলেটিকে নয় দশ বছরের মনে হচ্ছিল। সাজিদ দাঁড়িয়ে পড়তেই মালা বলল, মনে আছে তো কী বলছি?

– জ্বি। মনে আছে। আপনার সাথে আমার একটা জরুরি কথা আছে।

– জরুরি! কী কথা?

– জয়নবের মায় গোপনে আমারে বলছে, আপনারে যেন আইসা বলি, তার কিছু টাকা দরকার।

– কেন? তোর মামা না টাকা দিয়ে এল।

– মামা টাকা দিছে! নাতো।

কথা আর বাড়ালো না মালা। স্বামীর সম্মান বিকানো মেয়ে সে নয়। আস্তে করে বলল, কত টাকা চাইছে জয়নবের মা?

– তাতো কিছু বলে নাই। খালি বলছে, আপনি তার ভরসা। আপনি না তাকাইলে সে মইরা যাইব।

– বাজে কথা রাখ। জয়নবরে একটা খবর দিতে পারবি?

– পারব না কেন?

– তবে তোর মামা যেন না জানে।

কথার ফাঁকে কী যেন ভুলে যাওয়ার ভঙ্গিতে চোখে কয়েকটা পলক ফেলল মালা। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, না থাক। জয়নবরে আসতে বলার দরকার নাই। আমি টাকা পাবো কোথায়।

বড়ো বড়ো চোখে মালার দিকে তাকিয়ে রইল সাজিদ। সে কৌতুহলী

চাহনি চোখে পড়ার মতো সময় মালার নেই। সে সজোরে পা চালিয়ে ভিতরে চলে গেল। যে করেই হোক, জয়নবকে তার খবর পাঠাতে হবে। কিন্তু কিভাবে। সাজিদ, ড্রাইভার জাফর। কারো উপরই পুরোপুরি সে বিশ্বাস রাখতে পারে না।

ইতোমধ্যে বাটিতে মাংস ভরে ফেলেছে রুনির মা। কড়াইয়ে তখনো পড়েছিল কয়েক টুকরো। রুনির মা নিজে থেকেই বলল, মল্লিক সাবে গরম ভাতের সাথে গোশত ভুনা খাইতে চাইছিল।

রুনির মার মিথ্যে বলাটা ধরতে পারল মালা। ক্ষেপে গিয়ে বলল, মিথ্যা বলতে তোমারে বারণ করছি না? মিথ্যা হইল পাপের গুরু। খামুখা মিথ্যা বলো কেন?

শেকাবুর সাহেবের নাক ডাকার আওয়াজ ঘর-বারান্দার নিস্তব্ধতা ভেঙে ফেলেছে। পাশের চেয়ারের কোমল গদিতে মহা আরামে ঘুমিয়ে আছে রাইসা। বারান্দায় গিয়ে বসল মালা। প্রতি রাতে এখানে এসে সময় কাটায় সে। এ সময়টুকু তার একান্ত আপনার। সারাদিনের মাথায় চেপে বসা রাজ্যের ভাবনা ভেবে নেওয়ার সময়। ভাবনা ও কান্না তার খুব প্রিয় দুটি বিষয়। সারাদিন ভাবনারা আনাগোনা করে মনে। কিন্তু কান্নার সময় হয় না। রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

নাকের আওয়াজ শ্লথ হয়ে এসেছে। শেকাবুর সাহেব কি পাশ ফিরে শুয়েছেন? তার গতিবিধি বোঝা মুশকিল। জয়নবের মায়ের অপারেশনের টাকাটা দিয়ে এলে খুশি হত মালা। গত দুসপ্তাহ আগে দূর সম্পর্কের ফুফাতো ভাইকেতো দিয়েছিলেন। চিকিৎসা বাবদই। অবশ্য তার ধারণা, আত্মীয়ের হক সবার আগে। তারপর দুঃস্থ গরিব। এসব যুক্তি মানতে ইচ্ছে করে না মালার। সারাজীবন আশ্রিতের মতো জীবন কেটেছে তার। আপন-পর কাউকে আলাদা করতে শেখা হয়নি। যাকে কাছে পেয়েছে, তাকেই আপন মনে হয়েছে। বৃক্ষকেও আপন মমতায় পরম আদরে জড়িয়ে ধরতে পেরেছে।

সংসার খরচের টাকা থেকে সে ঠিকই জয়নবের মাকে টাকা পাঠাতে পারবে। এ ভাবনাটা চাঞ্চল্য এনে দেয় মালার মনে। শেকাবুর সাহেবকে মনে মনে অসংখ্যবার ধন্যবাদ জানায়। তারপর কয়েকবার আউড়ে যায়। মনে মনেই–

তবু যেটুকু পেলাম আমি...

প্রাণের চেয়েও দামি।

রাইসার চেয়ারের নরম গদির মতো তার আশ্রয়টুকুও অসামান্য। মালার চোখে পানি চলে এল। একটু একটু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। রাতের এই বাতাসটুকু মনে হয় স্বর্গ থেকে আসা। চুলের শক্ত খোপাটা খুলে দিল মালা।

জয়নবের করুণ চেহারাটা চোখের পর্দায় ভেসে উঠেছে আবার। অনিশ্চয়তায় ভর করে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা মাটির মূর্তি।

বাবা যেদিন মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এমনই নির্বাক তাকিয়েছিল মালা। রাজ্যের অনিশ্চয়তা চোখে। মায়ের সে কী কাকুতি–মিনতি। মালাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

কিন্তু কী বিস্ময়করভাবে বেঁচেছিলেন মা। মামারা শত চেষ্টা করেও আর দ্বিতীয় বিয়েতে রাজি করাতে পারেননি। ধুকে ধুকে শীতে-বরষায়-অমাবশ্যায় রোগে ভুগে মা নাকি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন কোথায়। কেউ জানে না। তার বেশ কিছুদিন পরে নদীতে নারীর লাশ ভেসে উঠার পর কেউ তাকে আর সনাক্ত করতে পারেনি। আর সবার মতো হয়তো মাটি তাকে পরিহাস করেনি। মাটির বুকেই হয়তো কোথাও মিশে গেছেন বেওয়ারিশ মা।

জীবন প্রকৃতির মতো। কখন কী রং ধরবে কেউ জানে না। মেঘময় আকাশ ফুঁড়ে কতবার ঝিকিমিকি তারাদের রাঙা বধুর মতো মুখ বের করা দেখেছে মালা। আবার এক ফোঁটা মেঘ নেই। মুহূর্তেই উড়ে আসা মেঘেদের দস্যুতায় তছনছ হয়েছে আকাশ। বজ্র গর্জনে এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছে পৃথিবী। প্রবল বর্ষণে আবার শ্রান্ত হয়েছে। প্রকৃতির প্রলয় খেলা, বোঝার সাধ্য কার।

বারান্দার ওপারে বিশাল বিশাল অট্টালিকার ভিড়। কত শত মানব সন্তানের লুকানো দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। প্রতিদিন কত শত মানুষের ওখানে আসা-যাওয়া, খোয়া যাওয়া, স্বপ্ন খুঁজে ফেরা, শিরা-উপশিরায় দুঃখবন্দী জ্বালা, যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মতো স্তব্ধতা, হৃৎপিণ্ডের মুষ্টি চেপে ধরা আর্তনাদ। কত কী নিয়ে বেঁচে থাকে মানুষ। কে কার খবর রাখে।

মাঝরাত পার করে অনেক দূর এগিয়ে যায় মালা। ঘুম আসে না। তবুও উঠতে হয়। গলার ভিতর খড়ার মতো লাগে। পানি খেতে ডাইনিং-এ যায় মালা। সাজিদকে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠে।

– কী হইছে...? ঘুমাস নাই?

– ঘুমাইছিলাম। খালাম্মার জ্বালায় ঘুমাইতে পারি নাই।

– কী করছে রুনির মা?

– মল্লিক সাবেরে গোশত খাইতে ডাইকা তুলছে। আমার ঘুম ভাইঙ্গা গেছে।

ডাক্তার দেখাতে গ্রাম থেকে আসা কাশির রোগী মল্লিক সাহেবের কাশির এতটুকু আওয়াজ এত রাতের নিস্তেজতায়ও শোনা যায় না। রুনির মার ভাষ্য মতে, তার পিছনে দাঁড়িয়ে কেবল খুক খুক করা মানুষটি এখন রাতের মতোই শান্ত, নিরব।

সাজিদ বলল, আমার গলা শুকাইয়া গেছে। পানি খাইতে আসছিলাম।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় মালাকে অসহায় মেষ শাবকের মতো লাগে।

চলবে...

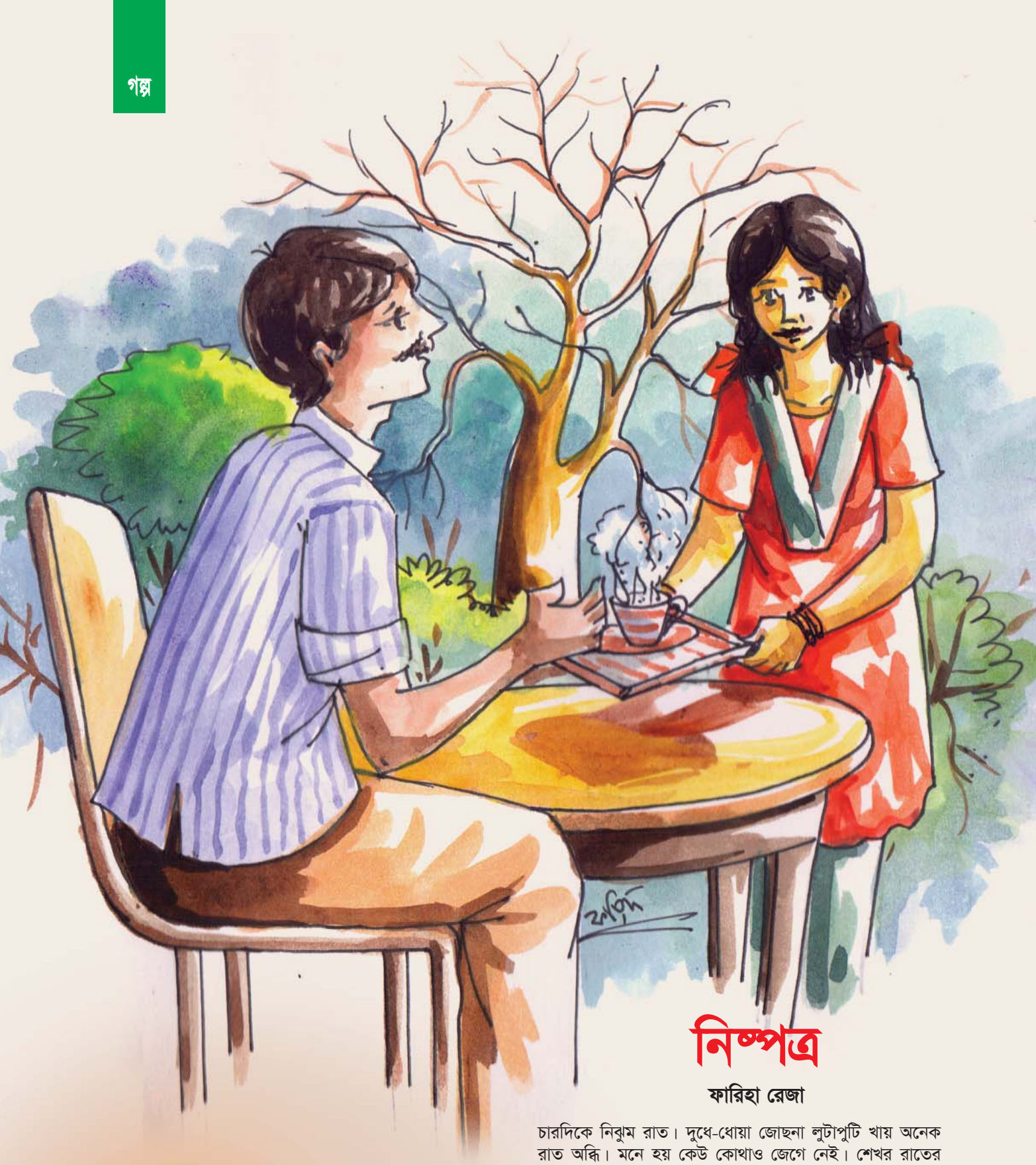

নিষ্পত্র

ফারিহা রেজা

চারদিকে নিঝুম রাত। দুধে-ধোয়া জোছনা লুটাপুটি খায় অনেক রাত অব্দি। মনে হয় কেউ কোথাও জেগে নেই। শেখর রাতের মতোই একা। নির্ঘুম সকাল। ঝরঝরে রোদের বালাই নেই কোথাও। কালোমেঘ নিচু হয়ে বাড়ির কিনারায় নেমে এসেছে যেন। মন খুব খারাপ হয়ে থাকে, চারপাশের আবহাওয়ার মতোই। অনেক স্মৃতিঘেরা 'শ্রাবণী কটেজ' ছেড়ে যেতে হবে ভাবতে শেখরের মন আজ আর হাহাকার

করে উঠছে না। মাস কয়েকের আনন্দঘন স্মৃতি একটি বিষাদগম্ভীর গল্পে পরিণত হয়ে শেখরের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায়। মনের মধ্যে বেদনা ঘনীভূত হয়ে এলে মেঘ-বৃষ্টি হয়ে একসময় ঝরেও যায়; কিন্তু বেদনার ঊর্ধ্বে বোধ করি স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা। এ বেদনা ভুলিয়ে দিতে পারে কেবল আর একটি জীবন ঘনিষ্ঠ স্বপ্ন।

খুলনার এই শহর ছেড়ে দিন দুই বাদে চলে যাবে শেখর ঢাকা শহরে। বন্ধুরা বলে– ঢাকা শহরের দেবার মতো কিছু নেই। এই ঢাকাতেই বড়ো হয়েছে শেখর। শৈশব-কৈশোর এবং যৌবনের সুন্দর দিনগুলো কেটেছে। মনে মনে হাসে শেখর, ঢাকা আমার তিলোত্তমা ঢাকা, তোমার একটা দুর্বার আকর্ষণ আছে ধরে রাখবার।

মুনমুন এল। মনে জমে থাকা বিষাদের বরফ একটু একটু করে গলতে থাকে। চায়ের পেয়ালাটা শেখরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে 'চা নাও'। শেখরের সেই পুরনো অভ্যাস, শয্যা চা পান। চা শেষ হওয়া অব্দি শেখরের উলটো দিকে একটি চেয়ারে বসে থাকে মুনমুন। 'আমাকে আর এক কাপ চা দিতে পার?' কেন পারি না? শেখরদা সারাদিন তুমি কত কাপ চা খাও বলতো?

'তোমার হাতে হলে সারাদিন চা খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারি'।

মুনমুন কপট রাগে ভ্রুর তলা দিয়ে আড়চোখে চাইল শেখরের দিকে। উঠে চলে যেতে যেতে বলল– চা কেউ খায় না বুঝলে, চা পান করে।

জি ম্যাডাম, চা খাওয়াটাই প্রচলিত, পান করাটা নয়। 'শ্রাবণী কটেজে' আসা অব্দি শেখরের দিনগুলো কাটছে ফুরফুরে হাওয়ায় ভর করে। মাস ছয়েক আগে খুলনা শহরে এসেছে শেখর। দিন দশেক একটানা বৃষ্টি ঝরেছিল, অতঃপর মেঘমুক্ত আকাশ। একদিন সকালে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এক ঝলক রোদ চাঁদ মুখের মতোই প্রিয় হয়ে উঠে। বিগত বাদলা দিনে মফস্বল শহরের কর্মব্যস্ততা, কোলাহলের কমতি ছিল না ঠিকই, কিন্তু কোথায় জানি হোঁচট খেয়ে চলার রেশ ছিল, তাল ভাঙার সুর ছিল। এমনি দিনে শেখর খুলনার একটি ব্যাংকে চাকরি নিয়ে আসে। শহরের জীবনযাপনের পরিবেশ রাজধানীর মতো না হলেও রাজধানীর বাড়তি কোলাহল, লোকজ বাতাস– এসবের কথা ভেবে শেখর খুলনায় যোগদানের ব্যাপারে আপত্তি তোলেনি।

মেঘে ঢাকা সকাল। শেখরের ঘুম ভাঙল লতিকার পোষা মুরগিগুলোর গলাভরা ডাকে। জানালার পর্দা সরিয়ে দেয় শেখর। সকালবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা নিত্যকার অভ্যাস শেখরের। মুনমুন কি এখনো ঘুমাচ্ছে? না জেগে আছে? বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ায় শেখর। বসন্তের শুরুতে কেমন বাদলা দিন। বাইরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে, সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। মুনমুন উঠানে দড়ির পরে লতিফার ফ্রক শুকাতে দিয়েছিল। উঠানে ফ্রকটি নিতে এসে জানালার দিকে চোখ যায় মুনমুনের।

শেখরের দিকে চেয়ে দু'চোখ ভরে হাসল মুনমুন। শেখর দেখল ওর চোখে ভালো লাগা।

সকালের নাস্তা সেরে মুনমুন এল শেখরের রূমে।

: একটা কথা বলব শেখরদা?

: হাজারটা বল।

: তুমি অফিস আর বাসা করেই কাটিয়ে দিচ্ছ, একটু বাইরে গেলেও পার। আমরাও বেড়াতে পারি তোমার সাথে।

: বেশতো আজই বিকেলে যাওয়া যাক।

বিকেল ঘনীভূত হয়ে আসতে শীত একটু একটু করে জীবন ঘেঁষা হয়ে উঠে। মুনমুন শুয়ে ম্যাগাজিনে চোখ রাখছিল। উঠে সুলেখাকে শোয়া থেকে তুলে দেয়। অনেক বিরক্তি নিয়ে বিছানা ছাড়ে সুলেখা। মায়ের নতুন অ্যাপয়েন্টম্যান্ট দেওয়া বুয়াটি মুনমুনের ভারি অপছন্দ। কাজেকর্মে একেবারে ফাঁকিবাজ। সুলেখা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বলে– আপা দেশে থাকতে আমি দুপুরে খেয়েদেয়ে 'ভাত ঘুম' দিতাম। মুনমুন মনে মনে একটু হাসল 'বিউটি স্লিপ'।

: ঠিক আছে যা, চায়ের পানি চাপা। চিড়া ভাজ।

: তোমার ফ্রেশ হয়ে আসতে কতক্ষণ শেখরদা?

: এই দুমিনিট। তুমি বরং ট্রেতে হাত লাগাও।

: ইস! চাতো একেবারে কুসুম শরবত।

: আমি এমনিতেই চা পান করি না। মাঝে মাঝে পান করলে ঠাণ্ডা করে পান করি।

: ইস, শেখরদা!

মুনমুন আজ বিকেলে পরেছে তাঁতের শাড়ি।

শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে পরেছে কপালে টিপ।

: তুমি কি রেডি চন্দ্রমুখী?

শেখর ছাড়া এ নামেতো মুনমুনকে কেউ কখনো ডাকেনি। তাই একটু চমকে উঠে মুনমুন।

ঝরঝরে আমুদে বিকেল। সূর্যের লাল আভায় বাড়ির চারিপাশ খিলখিল হাসিতে ভরে উঠছে। ফুরফুরে বাতাসে বাড়ির টবের গোলাপ আর ডালিয়ারা সানন্দে বৈকালিক স্বাধীনতা ভোগ করছে।

সেই এক জীবন, ব্যাংকের কাজ সারা আর বাড়ি ফেরা। ইদানীং বড়ো একাকী মনে হতো শেখরের। শেখর ভাবে মুনমুনের পরিবার তাঁর জীবনে যেন একমাত্র স্বস্তি।

মুনমুনের বাবা আলী আকবর সাহেব কিছুদিন ধরেই স্ত্রীকে একটি কথা বলবেন ভাবছেন।

পরিবেশ আর সময় কিছুতেই এক হচ্ছিল না, এমনিতেই ভীষণ ব্যস্ত মানুষ তিনি। আজ মনস্থির করলেন বিষয়টি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। স্বামীর কথা বেশ মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন জাহানারা বেগম।

: দেখ, একজন জায়গির মাস্টারের ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেব, একথা আমি ভাবতেই পারি না।

এছাড়া, নাদিমের সঙ্গে মুনমুনের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে সেই কবে থেকে।

: দেখ, জায়গির মাস্টারের প্রশ্নটা অবান্তর।

শেখরের বাবা কথিত অর্থে সারাজীবন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু একাত্তরে স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রাণ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি সত্যিকার অর্থেই একজন সফল ও মহান মুক্তিযোদ্ধা।

: প্রাণ দিয়েছেন বলেই কি তিনি একজন সফল মুক্তিযোদ্ধা?

: না, তাঁর বীরত্বের জন্য সফল। মৃত্যুর জন্য মহান।

: শেখর আমার বোনের ছেলে হতে পারে, ওকে আমি স্নেহের চোখে দেখি ঠিকই কিন্তু মেয়ের জামাই ভাবতে পারি না।

লতিফার চাচা নাদিম স্টেটে কম্পিউটার প্রকৌশলী। বছর আটেক হয় ঢাকা ছেড়েছে। ওখানেই মিতু হয়েছে। বড়ো ভাই লুৎফুরের

সঙ্গে যখন মুনমুনের বড়ো বোন শ্রাবণীর বিয়ে হয় তখনো সে বিয়েতে উপস্থিত হতে পারেনি নাদিম। মুনমুনের বোন আর বোন জামাইয়ের কাছে নাদিমের গল্প শুনেছে। সামনের গ্রীষ্মে নাদিম ঢাকা এলে বিয়েটা সেরে ফেলতে চান নাদিমের বাবা। নাদিমের পরিবারের সঙ্গে পুরনো সম্পর্কটা জাহানারা বেগম জিইয়ে রাখতে চান। এতদিন মুনমুনের বাবা আলী আকবর সাহেবেরও তা- ইচ্ছে ছিল।

রাস্তা দুর্ঘটনায় শ্রাবণী-লুৎফুরের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে লতিফা নানা বাড়িতেই থেকেছে। লতিফার খালা মুনমুনের কাছে মাতৃস্নেহে লালিত। ছোট্ট লতিফাকে কোলে-পিঠে করে লালন করতে গিয়ে কখন যে লতিফার জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে মুনমুন, তা সে নিজেও জানে না। মুনমুনের বাবা-মা সবদিক ভাবলেন, শেষে নাদিমের সঙ্গেই মুনমুনের বিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। আলী আকবর সাহেব অবশ্য পুরনো সম্পর্কটা আর জিইয়ে রাখতে চাইছিলেন না। কিন্তু লতিফার কথা ভেবে তেমন আপত্তিও তোলেননি।

শেখরকে খুব ভালো লাগে আলী আকবর সাহেবের। সুদর্শন স্মার্ট শেখরকে যে-কারো ভালো লাগতেই পারে। মনে মনে অংক কষেন মুনমুনের বাবা। মুনমুনের পাশে শেখরকে কল্পনা করে আনন্দিত হন তিনি। সেদিনের সেই দৃশ্যের কথা– শেখর সবে অফিস থেকে ফিরেছে। মুনমুনকে এক কাপ চা হাতে শেখরের রুমের দিকে যেতে দেখেন তিনি। শেখর বাইরের পোশাক পালটে ফ্রেশ হয়ে আসবে দেখে মুনমুন চা নিয়ে ওর রুমের দিকে আসছে।

: থ্যাঙ্ক ইউ মুন!

তারপর গলার স্বর নিচে নামিয়ে বলে,

: তুমি খুব চমৎকার মেয়ে মুনমুন।

: আপনি সুদর্শন-স্মার্ট, বয়স্ক-তরুণ।

: কি, তুই একটা বাদর ছুঁড়ি! মাঝেমধ্যে চুল ধরে প্রহার করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

: ইস! মেয়েরা কি স্বামীর হাতে শুধু চুল টানা আর প্রহারই খাবে। বলেই আরক্তিম কপোলে ভ্রুর তলা দিয়ে চাইল।

মুনমুনের কথার মানে বুঝতে কী সময় নিল শেখরের মন? কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল শেখর। তখনই আলী আকবর শেখরের ঘরের পাশ হয়ে বৈঠকখানার দিকে গেলেন।

সারারাত সুখময় স্বপ্নে বিভোর থাকে শেখর। অফিসে যাবার তাড়া থাকা সত্ত্বেও বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না। সকালের হলুদ নরম সোনা রোদ বিছানায় আছড়ে পড়ছিল। জানালার পর্দা সরিয়ে দেয় শেখর। অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখে ও।

অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল শেখর। জাহানারা বেগম এলেন শেখরের রুমে। শেখর কিছুটা অপ্রস্তুত হলেন, আমাকে ডাকেননি কেন খালা, আপনি কষ্ট করলেন কেন?

: না, ঠিক আছে। শেখর তোমার ট্রান্সফার হবার কথা ছিল। ও বিষয়টি কদ্দুর এগোলো? এ জাতীয় প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না শেখর। অফিস ট্রান্সফারের বিষয়টি দিয়ে কি বুঝাতে চাইছেন উনি? মুনমুন, ওর বাবা, ওনাদের কল্পিত চাওয়ার সাথে মেলাতে চেষ্টা করে শেখর।

অফিসের কাজ শেষে নিজের কথা সম্পূর্ণ করে ভাববার ফুরসত মেলে তাঁর। কাজ শেষে মুনমুনের ওখানে না গিয়ে প্রথম দিনের বেড়াতে যাবার জায়গাটা ওকে খুব করে টানে। সূর্য ডুবছে। আগুনের নদী সমস্ত আকাশ জুড়ে বয়ে চলছে ঝর্ণার বেগে। সেদিকে তাকিয়ে শেখরের মন হাহাকার করে উঠে। একটা অজানা বেদনায় সমস্ত মন তোলপাড় করে উঠে। মনে হচ্ছে কী যেন হারিয়ে যাচ্ছে, কী যেন খোয়া গেল তার। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বানডাকা চাঁদের আলো। বেশ রাত করে মুনমুনদের ওখানে ফেরে শেখর। মুনমুনকে তার রুমে বসে থাকতে দেখে একটু হোঁচট খায় শেখর। এত রাতে কোথায় ছিলে জিজ্ঞেস করে না মুনমুন। ঘর জুড়ে নীরবতা।

মুনমুনের পরনে শুধু রাতের পোশাক। অনেক্ষণ নতমুখে বসে থাকে ও। মুনমুনের সারা মনজুড়ে কান্নার নদী থই থই করছে। বুঝতে পারে শেখর। চোখের কোণ ভেজা।

মুখ তুলে চায় মুনমুন।

: বুবুকে, লতিফাকে আমি খুব ভালোবাসি শেখরদা-বলেই একটা প্যাকেট এগিয়ে দেয় শেখরের দিকে। মুনমুন বেরিয়ে যায় শেখরের রুম থেকে। বাবা-মা না ফেরার দেশে চলে গেছে সেই কবে। শৈশবে বাবাকে হারিয়ে মাকে ঘিরে বেঁচেছিল শেখর। মা চলে যাবার পরে এক রকম অনাত্মীয় পরিবেশেই দিন কেটেছে শেখরের। এতদিন মুনমুনদের পরিবার নিয়ে এক ধরনের স্বপ্নজাল ছিল শেখরের মনে।

মুনমুন চলে যেতে প্যাকেটটা খোলে শেখর। দেখে গত কয়েক দিনে তোলা ফটোগ্রাফসগুলো। প্যাকেটটা তুলে রাখতে গিয়ে ভাবল শেখর। জীবন এমনই ছন্দহীন, ক্যামেরার যেই অ্যাঙ্গেল থেকেই দেখা হোক না কেন জীবন সত্যি গদ্যময়।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাঙালি একটি শান্তিপ্রিয় জাতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, বাঙালিরা একটি শান্তিপ্রিয় জাতি এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালি সংস্কৃতির

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২০ জুলাই ২০১৬ ঢাকা সেনানিবাসে পিজিআর সদর দপ্তরে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন –পিআইডি

একটি ঐতিহ্য। ফলে দেশবাসী কোনো ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনাকে কখনো সমর্থন দেবে না, সহ্যও করবে না। ২০ জুলাই প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিডিআর) ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসে পিজিআর সদর দফতরের শহিদ ক্যাপটেন হাফিজ হলে আয়োজিত দরবারে ভাষণকালে রাষ্ট্রপতি উপরিউক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসী ও তাদের মদদদাতাদের মূলোৎপাটনে দলমতনির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সারা বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে সন্ত্রাসবাদেরও পরিবর্তন আসছে। এ কারণে পিজিআর সদস্যদের জন্য সময়োপযোগী ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে পারে।

তিনি আরো বলেন, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ এমন একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ড সারা বিশ্বে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি আশা করছি, 'আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে চেইন অব কমান্ডের প্রতি অনুগত থাকবেন। এতে রেজিমেন্টের দায়িত্ব পালনে সহায়ক হবে'। **প্রতিবেদন : মেজবাউল হক**

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ জুলাই ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা ২০১৬-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রিন হাউস গ্যাস ইফেক্টের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতি গড়ার পথই একমাত্র বিকল্প। এলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করে দেশের সবুজ অর্থনীতি নিশ্চিত করে পরিবেশগত সুরক্ষা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন ২০১৬, জাতীয় পরিবেশ অ্যাওয়ার্ড ২০১৬, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৫ ও সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক প্রদান করেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ইনস্টিটিউট মিলনায়তন প্রাঙ্গণে একটি তেঁতুল গাছের চারা রোপণ করেন এবং মেলা ঘুরে দেখেন।

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন সংশোধন আইনের খসড়া অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ আগস্ট মন্ত্রিসভার বৈঠকে পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেন। এছাড়া তিনি বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সব মন্ত্রণালয়কে সজাগ দৃষ্টি রেখে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার নির্দেশ দেন।

কংক্রিটের সড়ক নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ আগস্ট শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে একনেক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে তিনি জনগণের ভোগান্তি কমাতে এবং সড়কের স্থায়িত্ব বাড়াতে বিটুমিনের বদলে কংক্রিটের সড়ক নির্মাণের নির্দেশনা দেন। এছাড়া কারাবন্দিরা যাতে কর্মদক্ষতা অর্জন করতে পারে সেজন্য তাদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কারাবন্দিরা কর্মদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যেসব পণ্য তৈরি করবে, তা বিক্রির একটা অংশ যেমন তারা পাবে, পাশাপাশি শেষে তার এই কর্মদক্ষতা দিয়ে সে কর্মসংস্থানের সন্ধানও পাবে।

হজ ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ আগস্ট দক্ষিণ খানের আশকোনায় হজ ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে সরকার সুষ্ঠুভাবে হজ পালনের সব ব্যবস্থা নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। এখানে জঙ্গিবাদের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ জুলাই ২০১৬ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০১৬' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৬'– এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

কোনো স্থান নেই। এলক্ষ্যে ইসলাম ধর্মের সম্মান রক্ষায় সবাইকে সোচ্চার হতে এবং ছেলেমেয়েরা যাতে বিপথে যেতে না পারে সেজন্য অভিভাবক ও শিক্ষকসহ সকলকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের বহির্নোঙর থেকে পণ্য খালাসের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন –পিআইডি

একনেকে ছয় প্রকল্পের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ আগস্ট শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোট ৬টি প্রকল্পের অনুমোদন দেন। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১৮১৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা। প্রকল্প ব্যয়ের ১৮০২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা আসবে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে। আর ১৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে।

রক্তদান কর্মসূচির উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪১তম শাহাদত বার্ষিক উপলক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ উদ্যোগের মতো মহৎ আর কিছু হতে পারে না। জাতির পিতা আমাদেরকে রক্তঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। লাখো শহিদ আমাদেরকে রক্তঋণে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের রক্তের ঋণ আমাদেরকে শোধ করতে হবে। আপনারাও রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচান, মানুষের পাশে দাঁড়ান'। তিনি সরকারি কর্মচারীদেরকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। পরে তিনি রক্তদান কর্মসূচি ঘুরে দেখেন এবং রক্তদাতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ উচ্ছেদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ আগস্ট বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আয়োজিত ওলামা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জামিয়াতুল ওলামা এ সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ উচ্ছেদে দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং এই দুই অশুভ শক্তি উচ্ছেদে আলেম-ওলামাদের আরো সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া ইসলামের সঠিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য আলেম-ওলামাদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী।

পায়রা বন্দরসহ পাঁচ প্রকল্পের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ আগস্ট গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের বহির্নোঙর থেকে পণ্য খালাসের মাধ্যমে বন্দরটির অপারেশনাল কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তাঁর সরকার ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এ সময় পায়রা বন্দরকে ঘিরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে দেশের প্রথম ৮ লেন বিশিষ্ট যাত্রাবাড়ী–কাঁচপুর মহাসড়ক উদ্‌বোধন এবং যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিঙ্কসহ) মাওয়া এবং পাঁচচর-ভাঙ্গা মহাসড়ক উভয় দিকে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ উদ্‌বোধন, বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৬ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর বাস্তবায়নাধীন সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনের পর স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ আগস্ট ২০১৬ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতীয় শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে মোনাজাত করেন। প্রধানমন্ত্রীর ছোটো বোন শেখ রেহানা এসময় উপস্থিত ছিলেন –পিআইডি

জাতীয় শোক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪১তম শাহাদত বার্ষিক এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর

প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। পরে তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় এবং বিউগলে করুণ সুর বাজানো হয়। পরে তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর সমাধি চত্বরে আয়োজিত ১৫ আগস্টের সব শহিদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

তথ্যমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে জাতি ঐক্যবদ্ধ

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৬ জুলাই ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) আয়োজিত জঙ্গি বিরোধী সমাবেশ ও মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, জঙ্গি আর জঙ্গিবাদীদের বিরুদ্ধে জাতি ঐক্যবদ্ধ। তিনি বলেন, 'তারাবি ও ঈদের নামাজ না পড়ে যারা মানুষ হত্যা করে তারা কোনো ধর্মের অনুসারী হতে পারে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা গুলশানে হামলাকারী জঙ্গিদের দমন করেছি।' আস্থা রাখুন, শেখ হাসিনার সরকার ২৪ ঘণ্টা জেগে রয়েছে এবং জঙ্গি দমনে সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা অব্যাহত রাখবে।

হত্যা ও আত্মহত্যা উভয়ই মহাপাপ

মন্ত্রী ৩১ জুলাই ঢাকার শিল্পকলা একাডেমির নাট্যশালা ভবন সভাকক্ষে আসাদ সরকার নির্মিত *স্টপ সুইসাইড* স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় হত্যা ও আত্মহত্যা রোধে জনমত গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, হত্যা ও আত্মহত্যা উভয়ই মহাপাপ। জঙ্গিরাও এ অপরাধের আশ্রয় নেয়। এ ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা অবশ্যই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনি এ সময় চলচ্চিত্র নির্মাতা আসাদ সরকারের প্রশংসা করেন। মন্ত্রী বলেন, আত্মহত্যা ও হত্যা রোধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার জন্য সরকারের পাশাপাশি কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার ও শিল্পীদের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের আহ্বান

মন্ত্রী ২ আগস্ট জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জঙ্গিবিরোধী প্রচারপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। তিনি সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে বলেন, রাষ্ট্র প্রশাসন ও জনগণের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েছেন। পালানোর পথ নেই। তাই আত্মসমর্পণ করুণ। যদি আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে জঙ্গিবিরোধী অভিযান চলবে। জঙ্গি-সন্ত্রাসী উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে– রাষ্ট্র, জনগণ, মানবতা, ধর্ম রক্ষার জন্যই।

জঙ্গি-সন্ত্রাসকে বৈশ্বিক উৎপাত উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জঙ্গিরা মানবতার শত্রু, ইসলাম ধর্মসহ সব ধর্মের শত্রু, বাংলাদেশের শত্রু। দেশের বিরুদ্ধে জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা অঘোষিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তারা সংবিধান মানে না, সংস্কৃতি মানে না, দেশীয় ঐতিহ্য মানে না। তাই জনগণ ও প্রশাসন আজ এক কাতারে দাঁড়িয়েছে, জঙ্গিরা পরাজিত হবেই। **প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন**

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ২ আগস্ট ২০১৬ প্রেস ক্লাবে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস করবই নির্মূল' শীর্ষক লিফলেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন –পিআইডি

আমাদের স্বাধীনতা : বিশেষ প্রতিবেদন

'বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড' প্রামাণ্যচিত্রের প্রিমিয়ার শো উদ্‌বোধন

ঢাকায় ১০ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে *বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড* প্রামাণ্যচিত্রের প্রিমিয়ার শো উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। মুক্তিযুদ্ধে রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত একমাত্র বিদেশি ওলন্দাজ-অস্ট্রেলীয় নাগরিক ওডারল্যান্ড স্মরণে মাহমুদুর রহমান বাবু পরিচালিত এ প্রামাণ্যচিত্রটি প্রযোজনা করেছেন বাংলাদেশি নাগরিক সি আর প্লাসিড এবং জাপানি নাগরিক হরিইকে নাওয়া।

১৯১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর হল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডাম শহরে জন্মগ্রহণকারী উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড (Wiliam Abraham Simon Ouderland) ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় একজন সামরিক কমান্ডো অফিসার। বাটা স্যু কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নেদারল্যান্ডস থেকে ১৯৭০ সালের শেষ দিকে তিনি ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশকে ভালোবেসে ২ নম্বর সেক্টরের গণবাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে চতুর্থ সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'বীরপ্রতীক' প্রদান করে।

১০ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে 'বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড' প্রামাণ্যচিত্রের প্রিমিয়ার শো উদ্‌বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু

ওডারল্যান্ডই একমাত্র বিদেশি, যিনি এই রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

১৯৯৮ সালের ৭ মার্চ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ওডারল্যান্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় আসতে পারেননি। তিনি বীরপ্রতীক পদকের সম্মানী ১০ হাজার টাকা মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে দান করেন।

ওডারল্যান্ড তাঁর চাকরিস্থল বাংলাদেশের বাটা স্যু কোম্পানি থেকে ১৯৭৮ সালে অবসর নিয়ে তাঁর পিতার দেশ অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত যান। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থের এক হাসপাতালে ২০০১ সালের ১৮ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নামের সঙ্গে 'বীরপ্রতীক' খেতাবটি লিখতেন তিনি।

বাংলাদেশের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসার জন্য বাঙালি জাতির কাছে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশানের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

প্রামাণ্যচিত্রটির প্রিমিয়ার শো উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধের মতো জঙ্গি দমনের যুদ্ধেও বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ডের মতো বিদেশিরা আমাদের সাথে রয়েছেন। তিনি বলেন, জঙ্গিরাও পাক হানাদারবাহিনীর মতো দেশের ওপর তাদের মনগড়া ব্যবস্থা চাপাতে চায়, তাদের মতোই দেশ দখল করতে চায়। কিন্তু পাক হানাদারদের মতো জঙ্গিরাও হারবে। আর বিশ্ববাসী যেমন মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পাশে ছিল, জঙ্গি দমন যুদ্ধেও তেমনই সাথে রয়েছে।

বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড প্রামাণ্যচিত্রটির অন্যতম প্রযোজক সি আর প্লাসিডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এ প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে তাঁরা ইতিহাসকে সামনে এনেছেন, সার্বজনীন সত্যকে সামনে এনেছেন—তাঁদের প্রতি সত্যপ্রিয় সকলের অভিনন্দন। এসময় ইতিহাসে জঙ্গি-সন্ত্রাসী ঘৃণ্য তৎপরতার দিকে দৃষ্টিপাত করে ইনু বলেন, পঁচাত্তরেও পাক হানাদারদের মতো বিপথগামীরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে দেশ ও জাতির ইতিহাসকে দলিত-মথিত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সাবেক রাষ্ট্রদূত ড. এ কে এম আব্দুল মোমেন এবং লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, বিএফইউজ-এর সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, পিএসসি'র সাবেক চেয়ারম্যান ইকরাম আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব হোসেন ও সাংবাদিক রাজু আলীম অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রতিবেদন : আসিফ রহমান

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ

১-৭ আগস্ট : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে সপ্তাহব্যাপী পালিত হয় 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ-২০১৬'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো : টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি'

মন্ত্রিসভার বৈঠক

❑ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে

একনেক বৈঠক

২ আগস্ট : শেরেবাংলা নগর এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের ৭ প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন –পিআইডি

হজ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন

৩ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উত্তরার আশকোনা হজ ক্যাম্পে 'হজ কার্যক্রম-২০১৬' উদ্‌বোধন করেন

এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

৪ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কষ্টার্জিত অর্থের অপচয় না করে জনগণের কল্যাণে ব্যয় করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণ দিবস পালিত

৬ আগস্ট : বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৬তম মহাপ্রয়াণ দিবস

বঙ্গমাতার জন্মদিন উদ্‌যাপিত

৮ আগস্ট : নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে সারা দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব– এর ৮৭তম জন্মদিন উদ্‌যাপিত হয়

মন্ত্রিসভার বৈঠক

❑ সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'বিদ্যুৎ আইন ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে

একনেক বৈঠক

৯ আগস্ট : এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মোট ৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এগুলোর ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৮১৭ কোটি টাকা

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস

❑ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস'

জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

❑ জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সচেতন করে তুলতে প্রতিবছরের মতো এবারো যথাযথভাবে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালিত হয়

আলেমদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

১১ আগস্ট : রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ জমিয়াতুল উলামা আয়োজিত জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ওলামা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে আরো সোচ্চার হতে আলেমদের প্রতি আহ্বান জানান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ আগস্ট ২০১৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব– এর ৮৬তম জন্মবার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

পায়রা বন্দরসহ ৫ প্রকল্পের উদ্‌বোধন

১৩ আগস্ট : গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পায়রা বন্দরের বহির্নোঙর থেকে পণ্য খালাসের মাধ্যমে বন্দরটির অপারেশনাল কার্যক্রমসহ ৫টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় শোক দিবস পালিত

১৫ আগস্ট : সারা দেশে বিনম্র শ্রদ্ধায় বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্যদিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিক ও জাতীয় শোক দিবস পালন করে। বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল

হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি

একনেকে বৈঠক

১৬ আগস্ট : এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন নির্মাণসহ ৬টি প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে

এইচএসসি'র ফল প্রকাশ

১৮ আগস্ট : ২০১৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। পরীক্ষায় গড় পাস ৭২.৪৭ ভাগ। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের কপি তুলে দেন। পরীক্ষার ফলাফলে প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন

বিশ্ব মশক দিবস

২০ আগস্ট : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হয় 'বিশ্ব মশক দিবস'। **প্রতিবেদন : আখতার শাহীমা হক**

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

নতুন কেন্দ্রীয় কারাগার : পরিশুদ্ধ জীবন

দুইশ বছরের পুরনো রাজধানীর নাজিম উদ্দিন রোডে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের নতুন ঠিকানা হয়েছে কেরানীগঞ্জের রাজেন্দ্রপুরে। ১৯৪.৪১ একর জমির ওপর নির্মিত এই কারাগারে বন্দিরের জন্য রয়েছে নানা সুবিধা। অনেকের ধারণা কারাগারে যারা থাকে তারা সবাই অপরাধী। কিন্তু এ ধারণা ভুল। অপরাধ প্রমাণ না হলে তাকে অপরাধী বলা যায় না। তাই বন্দিরা নতুন কারাগারে পাবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ খোলামেলা পরিবেশ। নিরাপত্তার স্বার্থে উঁচু দেয়াল ছাড়াও রয়েছে ইলেকট্রিফাইড বারবেডওয়ার ফেসিং ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা এবং সীমানায় সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। কারা সীমানার মধ্যে রয়েছে ২০০ শয্যার হাসপাতাল। সংশ্লিষ্টরা ছাড়া স্থানীয় জনগণও প্রয়োজনে এখানে চিকিৎসা সেবা নিতে পারবেন। শুধু পরিবেশ নয়, নতুন কারাগারে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রণীত জেল কোডেও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তথ্যসূত্রে নতুন কারাগারটি আয়তন ও বন্দি ধারণক্ষমতার দিক থেকে এশিয়ার বৃহত্তম কারাগার।

স্বপ্নের পায়রা সমুদ্রবন্দরের কাজ শুরু

দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে পায়রা সমুদ্রবন্দর। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় অবস্থিত এ সমুদ্রবন্দরের কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৪ আগস্ট উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্‌বোধনের পর ৬টি লাইটার ও আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলকারী ৪টি বড়ো জাহাজ বহির্নোঙরে অবস্থানরত এমভি ফরচুন বার্ড থেকে পণ্য খালাসের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। ৩১ জুলাই ৫৩ হাজার টন পাথর নিয়ে জাহাজটি পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের বহির্নোঙরে আসে।

বাংলাদেশের ব্যান্ডউইথ ভুটানে রপ্তানি

ভারতের পর এবার বাংলাদেশের ব্যান্ডউইথ যাচ্ছে এশিয়ার আরেক দেশ ভুটানে। এরফলে আয় হবে কয়েক কোটি টাকা। বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ভারতে ১০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ রপ্তানি শুরু করে চলতি বছর থেকে। এক্ষেত্রে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইথের দাম ধরা হয়েছে ১০ (দশ) ডলার, এ হিসেবে আয় হচ্ছে ৯ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানির হাতে ২০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ আছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে ৫০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ রপ্তানি করতে সক্ষম।

দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক পাবে আর্থিক সুবিধা

দেশে প্রথমবারের মতো কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা কবলিত, নিহত বা কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আর্থিক সুবিধা পাবে শ্রমিকরা। সেইসাথে পাবে সামাজিক নিরাপত্তা। কোনো শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হলে অথবা তার মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তার পরিবার এককালীন অনধিক দুই লাখ টাকা অনুদান পাবে। এছাড়া মৃতদেহ সৎকারের জন্য শ্রমিক পরিবার পাবে ২৫ হাজার টাকা। দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১ লাখ টাকা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫ হাজার, মেধাবী সন্তানের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিক ২৫ হাজার টাকা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ ৩ লাখ টাকা, বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ২৫ হাজার টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এছাড়া শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমার প্রবর্তন এবং এ খাতে তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পরিশোধ করা হবে।

গুলশানে বিশেষ বাস-রিকশা

গুলশান, বনানী, বারিধারা ও নিকেতন এলাকায় ১০ আগস্ট, ২০১৬ থেকে বিশেষ রিকশা ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সেবা

চালু হয়েছে। এরফলে ঐসব এলাকার নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি যানজটও কমবে। ১ জুলাইয়ের পর থেকে গুলশান এলাকায় গণপরিবহণ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। জনগণের চলার সুবিধার্থে এ সেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ রঙের রিকশাও চলবে। গুলশানে ২০০টি, বনানীতে ২০০টি, বারিধারা ও নিকেতনে ৫০টি করে বিশেষ রঙের রিকশা চলবে। এসব রিকশার ওপরের অংশ হলুদ ও রিকশাওয়ালার গায়ে থাকবে কমলা রঙের বিশেষ পোশাক। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সহায়তায় এবং গুলশান, বারিধারা, বনানী ও নিকেতন সোসাইটির সহায়তায় 'ঢাকা চাকা' নামের বাস সেবা চালু হয়েছে। পুলিশ প্লাজা থেকে গুলশান ২ নম্বর গোলচত্বর এবং কাকলি মোড় থেকে নতুন বাজার– এই দুটি রুটে প্রতি ১০ মিনিট পর পর বাস ছাড়বে। প্রথম দফায় ১০টি বাস নিয়ে চালু হচ্ছে বাস সেবা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি বাস ৩৫ আসনবিশিষ্ট। একটি রুটের বাস ছাড়বে তেজগাঁও-গুলশান লিংক রোডের নাভানা মোড় থেকে। বাস পুলিশ প্লাজা, গুলশান–১ ও রূপায়ণ টাওয়ার হয়ে গুলশান–২ নম্বর গোলচত্বর পর্যন্ত যাবে। আরেক রুটের বাস ছাড়বে কাকলি মোড় থেকে। বনানী বাজার, গুলশান ২ নম্বর হয়ে যাবে নতুন বাজার। যে-কোনো দূরত্বের ভাড়া ১৫ টাকা।

পুলিশের অ্যাপে জঙ্গিদের তথ্য

জঙ্গি নির্মূলে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে নতুন একটি মোবাইল অ্যাপ আনছে পুলিশ। 'হ্যালো সিটি' নামের এই অ্যাপ ১ আগস্ট উদ্‌বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। এই অ্যাপের মাধ্যমে তথ্যদাতা সন্দেহভাজন জঙ্গি তৎপরতার ছবি অডিও ও ভিডিও পুলিশকে পাঠাতে পারবেন কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই। **প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ**

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় আরো ২৩ নারী

মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের হাতে নির্যাতিত আরো ২৩ জন বীরাঙ্গনাকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে খুব শীঘ্রই গেজেট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে এ তথ্য জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

মন্ত্রী জানান, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদারবাহিনীর হাতে যেসব নারী সম্ভ্রম হারিয়েছেন, যারা নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন সেসব বীরাঙ্গনার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাদের সম্মানী ভাতা দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালে ৪১ জন বীরাঙ্গনার নাম মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ২০১৬ সালের মার্চ মাসে আরো ২৬ জন নারীর নাম মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের ইসমাত জাহান

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদর দপ্তর ব্রাসেলসে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) প্রতিনিধিত্ব করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশের কূটনীতিক ইসমাত জাহান। সম্প্রতি ওআইসি'র মহাসচিব আয়াদ আমিন মাদানি তাঁকে এ পদে নিয়োগ দেন।

এর আগে কূটনীতিক ইসমাত জাহান দুবার জাতিসংঘে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমান পদে নিয়োগের আগে তিনি যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ব্রাসেলসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইসমাত জাহান সরকারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আগামী চার বছর ওআইসি'র প্রতিনিধিত্ব করবেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রান্তিক নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ

নগরভিত্তিক প্রান্তিক নারী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের শহরাঞ্চলের প্রান্তিক নারীদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় চালু করেছে সরকার। সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রকল্পটি অনুমোদন দেয়। ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মহিলা সংস্থা।

শহর এলাকার দরিদ্র ও অসহায় নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি হাতে নেয় সরকার। এ প্রকল্পে মোট ৮টি ট্রেডে মোবাইল ফোন মেরামত, হাউসকিপিং, মাশরুম চাষ, বিউটি পার্লারসহ আরো কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ১৮ কোটি ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে ২৭ হাজার ৬শ সুবিধাবঞ্চিত নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২২ নারী পেলেন স্কুটি

দেশে প্রথমবারের মতো নিয়োগ পাওয়া নারী সার্জেন্টদের মধ্যে স্কুটি বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

সম্প্রতি ডিএমপি'র সদর দপ্তরে ২২ জন নারী সার্জেন্টের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুটি তুলে দেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া।

নারী সার্জেন্টরা যাতে আরো নিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন সেজন্য তাদের হাতে স্কুটির চাবি তুলে দিয়ে কমিশনার বলেন, নারীদের পুলিশবাহিনীতে বিশেষ করে ট্রাফিক বিভাগে কাজ করা একটি দৃষ্টান্ত। নারী সার্জেন্টরা যে কষ্ট করে দায়িত্ব পালন করছেন এজন্য তাদের স্যালুট জানাই।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পুলিশবাহিনীতে স্কুটির ব্যবহার শুরু হলো।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী

যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে সম্প্রতি হিলারি ক্লিনটনকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আর এতেই সৃষ্টি হলো ইতিহাস। দেশটির ২৪০ বছরের ইতহাসে এই প্রথম একজন নারী কোনো প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেলেন।

২০০৮ সালে হিলারি প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁর দলের মনোনয়নের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১ কোটি ৪০ লাখ ভোট পাওয়ার পরও তিনি নিজে দলের একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের জন্য বারাক ওবামার নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

সম্মেলনে হিলারি সম্পর্কে সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে হিলারি নারী ও শিশুদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছেন।

নারী কারারক্ষীদের জন্য আবাসন

দেশের কারাগারগুলোতে কারাবন্দিদের পাশাপাশি কারারক্ষীদের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। আর এই বর্ধিত নারী কারারক্ষীদের জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮টি বিভাগের ৪১টি জেলা কারাগার ও নয়টি কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রায় ৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর।

প্রকল্পের আওতায় নারী কারারক্ষীদের জন্য ৬০০ বর্গফুট আয়তনের মোট ৪৫৬টি আবাসন ইউনিট ও ১৪টি জেলা কারাগারে ১টি করে মোট ১৪টি নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে।

প্রতিবেদন : জান্নাতে রোজী

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৭ জুলাই কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আলেমদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় ভাষণকালে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, খালি আইন দিয়ে বা জোর খাটিয়ে কারো মন আটকানো যাবে না। সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলনের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৭ জুলাই ২০১৬ ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে আলেমদের ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন —পিআইডি

ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করতে হবে। সভায় উপস্থিত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মসজিদে ইমামতি এবং ওয়াজ মাহফিলসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার সময় কোরান ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরে জনসচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানান। মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ করার এবং জঙ্গিবাদ নির্মূলে সচেতনতা বাড়ানোর নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সব শিক্ষার্থীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে হবে। শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ, চালচলন নজরে রাখতে হবে। মায়া-মমতা দিতে হবে, যাতে তারা মন খুলে সব কথা বলে। এলক্ষ্যে সভা করে অভিভাবকদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিবেক জাগ্রত করার মতো বই পড়ার আহ্বান

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট ৩০ জুলাই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির সেরা সংগঠক সম্মাননা পুরস্কার বিতরণ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণকালে মন্ত্রী বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানুষ হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মানুষ হত্যা মহাপাপ। ইসলামের নামে যেসব শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে তারা ভুল শিক্ষা পাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, যারা বই পড়ে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না। কারণ বই মানুষকে আমূল পরিবর্তন করতে পারে। এলক্ষ্যে মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের বিবেক জাগ্রত করার মতো ভালো বই পড়ার আহ্বান জানান। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, সন্তানদের শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, ভালো মানুষ হিসেবেও গড়ে তুলতে হবে। পরে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগের ১৫৩ জন লাইব্রেরিয়ানের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় শীর্ষক সভায় শিক্ষামন্ত্রীর অংশগ্রহণ

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৩১ জুলাই শিক্ষা ভবন চত্বরে আয়োজিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে 'শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক এক সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মন্ত্রী মাউশি'র ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে নিবেদিতপ্রাণে দায়িত্ব পালনের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশ দেন। এছাড়া কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর

বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেই তাৎক্ষণিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক

দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঠিক সময়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ৭ আগস্ট পরিপত্র জারি করে। পরিপত্রে বলা হয়, এ নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষক, ক্লাস্টারের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

অনুমোদন ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না চালানোর নির্দেশ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম)- তে উচ্চ মাধ্যমিকে অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে ঢাকা মহানগরীর সরকারি ও বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি অনুষ্ঠানে অনুমোদন ছাড়া কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেউ চালাতে পারবে

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ৯ আগস্ট ২০১৬ তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে সংস্কৃতি চর্চা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সভায় উপস্থিত ছিলেন —পিআইডি

না বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া অনুমোদনহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতি চর্চা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ৯ আগস্ট 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সাংস্কৃতির জাগরণ' শীর্ষক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংস্কৃতি চর্চা তৃণমূল পর্যায়ে জোরদার করা হবে। এজন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সহায়তা নেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সংস্কৃতির শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সংস্কৃতি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসায় সংস্কৃতি চর্চা জোরদার করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অভিভাবক, স্থানীয় ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের নিয়ে সভা করবে বলেও উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। **প্রতিবেদন : মো. সেলিম**

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসায় অবদানের জন্য পুতুলকে সম্মাননা

মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য 'ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদক' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। বারডেম হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে ৩০ জুলাই ২০১৬ এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে 'ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্মৃতি পরিষদের' দেওয়া সম্মাননা তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তাঁর সঙ্গে সম্মাননা পেয়েছেন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ খান।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডায়াবেটিস প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা ও ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের 'গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড' পাওয়ায় এ কে আজাদ খানকে এবং 'অটিজম ও নিউরোডেভলপমেন্টাল ডিসওর্ডারস' মোকাবিলায় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আর্তমানবতার সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করেন জাতি তাঁদের চিরদিন স্মরণ রাখে। ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন'।

ডা. সি এম দিলওয়ার রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ সাঈদ উদ্দিন, জাতিসংঘের বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি এ কে আবদুল মোমেন ও ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্মৃতি পরিষদের উপদেষ্টা এ আর খান।

আলোকিত প্রতিবন্ধী জেসমিন

প্রতিবন্ধীরা সমাজের বোঝা নয়, আশীর্বাদ– এর স্বাক্ষর রেখেছেন যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল এলাকার প্রতিবন্ধী নারী জেসমিন। নিজের মেধা, মনন ও মমতা দিয়ে পড়িয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকদের হৃদয় স্পর্শ করেছেন প্রতিবন্ধী জেসমিন। তিনি আজ সমাজের কাছে প্রতিবন্ধী নন, আলোকিত নারী। হাতের ওপর ভর দিয়ে হেঁটে জেসমিন গ্রামের বৈঠকখানায় তিনবেলা পড়াচ্ছেন শিশু-কিশোরদের। তার কাছ থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষা পেয়েছে ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী। তাদের অনেকেই ডাক্তার,

প্রকৌশলীসহ ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে, জেসমিন সমাজের বোঝা নয়, আশীর্বাদ– গ্রামের শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাদের সন্তানদের গড়ে তুলছেন শিক্ষিত করে। শিক্ষার্থী সুরাইয়া ইয়াসমিন সাথী ও বিথি বলেন, জেসমিন আপা আমাদের মায়ের মতো আদর করে পড়ান। তার কাছে পড়তে ভালো লাগায় মনোযোগ দিয়ে পড়েন তারা। পরীক্ষার ফলও ভালো হয়।

যশোরের শার্শা উপজেলার গোগার ইছাপুর পল্লিতে জন্ম নেওয়া আবদুল মজিদের প্রতিবন্ধী মেয়ে জেসমিন খাতুনের শরীরের নিচের অংশ বিকলাঙ্গ। দুইটি পা ছাড়াই জীর্ণ দেহে হাতের ওপর ভর দিয়ে মাদরাসায় লেখাপড়া করেছেন। দাখিল পাস করে রেখেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অভাবের সংসারে প্রতিবন্ধী নারী জেসমিন বাড়ির সামনে ছোটো একটি ঘরে গ্রামের শিক্ষার্থীদের পড়ান। মাসে ৫০ থেকে ১০০ টাকা করে দেন তারা। এ দিয়েই চলছে তার সুখের জীবন। তার কাছে পড়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করায় বাড়তে থাকে সুনাম ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা। ৯ বছর আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন জেসমিন। তবে তার কোলে আসেনি সন্তান। এতে কোনো অনুশোচনা নেই তার। তিনি শিশুদের মায়ের আদরে পড়িয়ে পান সুখ-তৃপ্তি।

তথ্যসূত্র: *আলোকিত বাংলাদেশ*। **প্রতিবেদন : আফরোজা আক্তার**

জেন্ডার ও নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

জেন্ডার বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ

সংবিধানের আলোকে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো Convention of the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)।

নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনি ইশতাহারের আলোকে নারীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে এই মন্ত্রণালয় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনার আওতায় এদেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২১) তে এমন একটি দেশ গঠনের কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণের ওপর

জোর দেওয়া হয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষের থাকবে সমান সুযোগ ও অধিকার আর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে নারীর অবদান থাকবে সমান।

এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, 'উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করা'। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে ৪টি কৌশল হচ্ছে– নারীর দক্ষতা উন্নয়ন, নারীর অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি, নারীর মতামত প্রকাশের অধিকার এবং নারী উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।

প্রতিবেদন : সুফিয়া বেগম

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণ করছে সরকার

বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষের জটিল রোগের উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণ করছে সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) হবে এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতাল। এ উপলক্ষে ১৭ আগস্ট ২০১৬ হাসপাতালের কনসালট্যান্সি কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জানানো হয়, ২০১৯ সালের মধ্যেই সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের কেবিন ব্লকের পেছনে নিজস্ব ৩ দশমিক ৮২ একর জমিতে নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম সেন্টার—বেজড সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল। অত্যাধুনিক এ হাসপাতালে কার্ডিওভাসকুলার, কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি, হেপাটোবিলিয়ারি অ্যান্ড অ্যান্ডোক্রাইনোলজি, অ্যাক্সিডেন্টাল ইমার্জেন্সি, মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার, অনকোলজিসহ থাকবে মোট ১১টি সেন্টার। হাসপাতালটি নির্মিত হলে এসব সেন্টারে সংশ্লিষ্ট রোগের যাবতীয় চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে এবং জনসাধারণ দেশেই সুলভে সর্বোচ্চ মাত্রার স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। পাশাপাশি বিএসএমএমইউ'র বর্তমান অবস্থার আরো উন্নতি হবে।

বিএসএমএমইউ'র ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান বলেন, বিএসএমএমইউ'র অধীন সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল

নির্মাণের মধ্যদিয়ে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে একটি বড়ো স্বপ্ন পূরণ হবে। উল্লেখ্য, ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল প্রকল্পের অনুমোদন দেন। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৩৬৬ দশমিক ৩৪ কোটি টাকা।

মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসায় অবদান রাখায় সায়মা ওয়াজেদকে সম্মাননা

মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য 'ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদক' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে

ও বিশিষ্ট অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন। ৩০ জুলাই ২০১৬ বারডেম হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। 'অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসওর্ডারস' মোকাবিলায় অবদানের স্বীকৃতির জন্য সূচনা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আর্তমানবতার সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করেন জাতি তাদের চিরদিন স্মরণ রাখে। ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।' **প্রতিবেদন: আমজাদ হোসেন**

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিনম্র শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ

হাতে ফুল, হৃদয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আর কণ্ঠে সব ঘাতকের ফাঁসি কার্যকরের দৃপ্ত শপথ নিয়ে বাঙালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে জাতি। একই সঙ্গে স্মরণ করে তাঁর পরিবারের নিহত সদস্যদের। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর একদল ঘাতকের হাতে সপরিবারে জীবন দিতে হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঘাতকের গুলি থেকে রেহাই পায়নি তাঁর পরিবারের ছয় বছরের শিশু থেকে অন্তঃসত্ত্বা নারীও। ১৫ আগস্ট ২০১৬ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার মধ্যদিয়ে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। সকাল সাড়ে ৬ টায় রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ খান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন দুই গুণী

রবীন্দ্র গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের জন্য অধ্যাপক সৈয়দ আকরাম হোসেন ও রবীন্দ্র সংগীত চর্চায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতির জন্য শিল্পী তপন মাহমুদ পেয়েছেন বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র পুরস্কার। ৭ আগস্ট একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে দুই দিনের অনুষ্ঠানের শেষ দিন ছিল একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। রবীন্দ্র বিষয়ক একক বক্তৃতা দেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা।

তাজউদ্দীন আহমদের ৯১তম জন্মবার্ষিকী

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ৯১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ২৩ জুলাই তাজউদ্দীন আহমদ স্মৃতি সংসদের আয়োজনে গ্যালারি টোয়েন্টিতে অনুষ্ঠিত হয় তাঁর কর্মময় জীবনভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে তাজউদ্দীন আহমদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র স্থান পায়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময়কার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনায় বিভিন্ন মুহূর্তের ছবিও ছিল এ প্রদর্শনীতে। তাজউদ্দীনের মেয়ে সিমিন হোসেন রিমির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

নাট্যচক্রের ৪৪ বছর

নাট্যচক্রের ৪৪ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১০ আগস্ট শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে সম্মাননা জানানো হয় সংগঠক যাত্রাশিল্পী মিলনকান্তি দে ও অভিনেতা মাহমুদ সাজ্জাদকে।

মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে যাত্রা শুরু করে নাট্য সংগঠন নাট্যচক্র। অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার ও নাট্যচক্রের অন্যতম সদস্য শেখ কামালকে স্মরণ করে সংগঠনটির সহসভাপতি গোলাম সারোয়ার। অনুষ্ঠান শেষে দলের পাঁচটি নাটকের অংশবিশেষ নিয়ে মঞ্চস্থ হয় বিশেষ নাটক 'মৌচাক'।

মুজিব মানে মুক্তির মঞ্চায়ন

নীরবতা ভেদ করে মঞ্চ কাঁপিয়ে উচ্চকণ্ঠে সেই চিরচেনা উচ্চারণ– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' প্রতীকী বঙ্গবন্ধু তখন মঞ্চে। বজ্রকণ্ঠে সেই অমর স্বাধীনতার ডাক। যেন ফিরে এসেছে সেই সাতই মার্চ। মিলনায়তনটিই যেন রেসকোর্স ময়দান। ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ

শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হওয়া মুজিব মানে মুক্তি'র নাটকের একটি দৃশ্য।

১৫ আগস্ট ছিল ইতিহাসের বেদনাবিধুর ও বিভীষিকাময় এক দিন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদত বার্ষিকী। এ দিনটিকে উপলক্ষ করে বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করে জাতীয় নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হয় নাটকটি। নাট্যজন লিয়াকত আলীর গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় থোক নাট্যদল এটি মঞ্চস্থ করে। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনভিত্তিক ও ঐতিহাসিক নাট্য আখ্যান এটি।

নাট্য মঞ্চায়ন শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মাহবুব আহমেদ। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ডিজিটাল বাংলাদেশ

উচ্চ ক্ষমতার ডাটা সেন্টার আসছে ই-টেন্ডারিং এ

সরকারি সব কেনাকাটায় (দরপত্র) ই-টেন্ডারিং চালু করতে কেনা হচ্ছে উচ্চ ক্ষমতার ডাটা সেন্টার। এটি কিনতে আরো এক কোটি ডলার ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা। এর অংশ হিসেবে সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি ঋণ চুক্তি সই হয়েছে। ২৫ জুলাই ২০১৬ রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) অতিরিক্ত সচিব কাজী শফিকুল আযম এবং ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত আবাসিক প্রধান রাজেশ্বরী এস পারালকার। এ সময় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের (সিপিটিইউ) মহাপরিচালক ফারুক হোসেনসহ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতায় দেশ সেরা ১০টি উদ্যোগ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে তরুণ উদ্যোক্তাদের নিয়ে সম্প্রতি আয়োজিত কানেক্টিং স্টার্টআপ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ১০ উদ্যোগের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ, বেসিস, বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ছিল আয়োজক। উদ্যোক্তাদের আইটি ইনকিউবেটরে ফ্রি জায়গা বরাদ্দের পাশাপাশি এক বছরের অর্থ সংস্থান, উদ্ভাবনী তহবিলের অনুদান, প্রশিক্ষণ ও আইনি সহায়তাও দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতায় ৪৩৪টি উদ্যোগের ধারণা জমা পড়েছিল। প্রতিযোগিতার সেরা ১০টি উদ্যোগ হলো : ইন্টারঅ্যাকটিভ থেরাপি, হিরোস অব ৭১, খুঁজুন, জিয়ন, বিডিয়েটস ডটকম, অ্যাপ্লিকেশন ককপিট, ম্যাডভাইজার, সিক্স অ্যাক্সিস, ইশকুল ও কগনেটিভ হেড হান্টার।

তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে : জয়

তরুণ উদ্ভাবক ও উদ্যোক্তাদের হাত ধরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাংলাদেশ একদিন গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। দেশের প্রথম সফ্টওয়্যার ইনকিউবেটর উদ্‌বোধন শেষে তিনি এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'তথ্যপ্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক সমৃদ্ধ একটি দেশে রূপান্তর করার জন্যই সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের রপ্তানি দেশের পোশাক খাতকে ছাড়িয়ে যাবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এর আগে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ারে উদ্‌বোধন করা হয় দেশের প্রথম সফ্টওয়্যার ইনকিউবেটর।

পরে প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের এক অনুষ্ঠানে জয় বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্টার্টআপের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আজকের সেরা দশ স্টার্টআপ বিজয়ীই তার প্রমাণ। এই বিজয়ীরা তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন দিয়ে দেশের আইসিটি শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তারা বিশ্বের আইসিটি শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের আইসিটি শিল্পকে পরিচয় করিয়ে দেবে।

বিপিও সামিট ২০১৬

ডিজিটাল বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বিপিও খাতের বয়স সমসাময়িক। ৬ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে আজ অবধি এই সাড়ে ৭ বছর সময় একটি দেশ, একটি ব্যবস্থাপনা এবং একটি স্বপ্ন পরিবর্তনের জন্য পরিব্যাপ্ত নয়, অনেকটা দুঃসাধ্যই বলা চলে। তবুও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের নেতৃত্বে সেই অসাধ্য সাধনে আমরা লক্ষ্যণীয়ভাবে এগিয়ে চলেছি। এই নিরলস পরিশ্রমের ফসলও বাংলাদেশ ঘরে তুলতে শুরু করেছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল। প্রায় শূন্য হাতে যাত্রা করা ডিজিটাল কর্মযজ্ঞে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং এককভাবে আয় করছে ১৮ কোটি মার্কিন ডলার। সস্তা শ্রম, দক্ষ জনশক্তির প্রাচুর্য ইত্যাদি ফ্যাক্টরের ফলে বাংলাদেশ বিপিও খাতে এগিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা জাগিয়েছে।

আমাদের রয়েছে একদল কর্মঠ ও উদ্যমী তরুণ জনশক্তি, যাদের ৬৫ শতাংশের বয়স এখনো ৩৫ বছরের নিচে। এসব গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বিবেচনায় এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে সরকার এই খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন– ফ্রিল্যান্সিং ও টপআপ প্রশিক্ষণ প্রদান, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত ফাইবার অপটিক কেবল স্থাপন ও ২০০১ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসহ প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কম্পিউটার ল্যাব

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, হাইটেক পার্ক ও আইটি পার্কে বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন ইত্যাদি অন্যতম। এরকম আরো নানাবিধ উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ আইসিটি ইকো সিস্টেম গড়ে তুলতে শেখ হাসিনার সরকারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ২৮ ও ২৯ জুলাই ২০১৬ বিপিও সামিট অনুষ্ঠিত হয়। এর তথ্য প্রকল্প করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

৮০ লাখ টাকার বেশি টার্নওভার হলে অনলাইনে নিবন্ধন

চলতি জুলাই মাস থেকে নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন বাস্তবায়ন করার কথা থাকলেও তা এক বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ আইনটি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি এগিয়ে নিতে চায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর অংশ হিসেবে আগামী আগস্ট মাস থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনলাইনে ব্যবসায় শনাক্তকরণ নম্বরের (বিআইএন) নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করা হয়।

যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৮০ লাখ টাকার বেশি, তাদের অবশ্যই অনলাইনে বিআইএন নিতে হবে। এটা অনেকটা অনলাইন কর শনাক্তকরণ নম্বর বা ই-টিআইএন-এর মতো। ঘরে বসেই ব্যবসায়ীরা এ নিবন্ধন নিতে পারবেন। বিবরণীর দাখিলসহ কর পরিশোধও করতে পারবেন। ইতোমধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের সনাতন পদ্ধতিতে বিআইএন নেওয়া আছে, সেসব প্রতিষ্ঠানকেও এখন নতুন করে অনলাইন নিবন্ধিত হতে হবে।

আগামী ২২ আগস্ট অনলাইনে বিআইএন নেওয়ার কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের চূড়ান্ত অনুমোদনের সাপেক্ষে এ কার্যক্রমের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে।

প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফফাত আঁখি

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ অনুমোদন

কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি কর্মযজ্ঞ স্বরূপ সম্প্রতি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোডম্যাপ'। মহা এই কর্ম পরিকল্পনাকে তিনটি ধাপে ভাগ করে ২০৪১ সাল পর্যন্ত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের বিভিন্ন টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে রোপণ প্রক্রিয়ায় শূন্য দশমিক ১ শতাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার হলেও ২০৪১ সালের মধ্যে সরকার তা ৮০ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে ৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্য থাকলেও ২০৪১ সালের মধ্যে কৃষির প্রায় ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে যন্ত্র ব্যবহারের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্য সরকারের। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রান্তিক কৃষকের মাঝে যান্ত্রিক সুবিধা সম্প্রসারণে কৃষক পর্যায়ে ভাড়ায় কৃষি যন্ত্রপাতি সেবা প্রদান প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

কৃষির সাথে সম্পৃক্ত একাধিক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি রোডম্যাপটি প্রস্তুত করে, যা সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়। সরকারের অনুমোদন দেওয়া রোডম্যাপ প্রসঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শ্রমিকের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। শ্রমিকরা গ্রাম থেকে শহরে চলে যাওয়ায় বেড়ে চলেছে মজুরি। অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হচ্ছে সময়, শক্তি। এমন পরিস্থিতিতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অনিবার্য। আর এলক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সময়কে টার্গেট করে এটি একটি মহা কর্মপরিকল্পনা। তিনি আরো বলেন, কৃষকের কাছে যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করতে এই পরিকল্পনায় নানা উদ্যোগ রয়েছে। যন্ত্র তৈরিতে দেশীয় প্রতিষ্ঠান যাতে এগিয়ে আসে এবং তারা বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হয় সে দিকেও বিশেষ মনযোগ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে উপযুক্ত বিদেশি যন্ত্রকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

১৬২ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চা উৎপাদনের প্রত্যাশা

অনুকূল আবহাওয়া ও পোকামাকড়ের আক্রমণ না হওয়ায় ১৬২ বছরের ইতিহাসে এবার দেশে সর্বোচ্চ পরিমাণ চা উৎপাদনের আশা করছেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ চা বোর্ডের মহা ব্যবস্থাপক মো. শাহজাহান আকন্দ বলেন, এবার পোকামাকড়ের আক্রমণ নেই। বাগানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রেড স্পাইডারের আক্রমণ ছিল না। সব মিলিয়ে চা উৎপাদনের জন্য এবার আবহাওয়া অনুকূলে রয়েছে। উৎপাদন সর্বকালের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি। তিনি আরো বলেন, ২০১৫ সালে দেশে উৎপাদন হয়েছিল ৬ কোটি ৬২ লাখ ২০ হাজার কেজি চা। এটি ছিল এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ চা উৎপাদন। কিন্তু চলতি বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে এই রেকর্ড ভঙ্গ হবে। আশা করা হচ্ছে, এবার ৭০ মিলিয়ন কেজি অর্থাৎ ৭ কোটি কেজি চা উৎপাদিত হবে।

উল্লেখ্য, দেশে ১৬৪টি চা-বাগানের মধ্যে ১৪৪টি চা-বাগান রয়েছে সিলেটে। চা বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, ব্ল্যাক টি, গ্রিন টি, সিলভার টি'র পর সম্প্রতি চা বোর্ড নতুন একটি চা বাজারে আনবে। এটি ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে সাতকড়া চা নামে। চা পানকারীদের জন্য এটি হবে আরেক আকর্ষণ। সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সাতকড়া ও চায়ের সংমিশ্রণে তৈরি এ চা খুব শীঘ্রই বাজারজাত করা হবে। যার বাজারমূল্য হবে প্রতি কেজি ১৫০০ টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ সাতকড়া চা ব্রিটেনসহ বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে রপ্তানির পরিকল্পনা রয়েছে।

আখ চাষিদের মুখে হাসি

অনুকূল আবহাওয়ায় এবার আখের বাম্পার ফলনে হাসি ফুটেছে চাঁদপুরের কৃষকদের মুখে। চলতি বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৬৬ হেক্টর জমিতে আখের চাষ হয়েছে এই জেলায়। রঙ্গবিলাস নামের নতুন জাতের একটি আখ চাষ শুরু করেছেন কৃষকরা এ বছর। নতুন জাতের এই আখটির ফলন দেশীয় জাতের আখের তুলনায় অনেক বেশি। পাশাপাশি রঙ্গবিলাসের বাজার দরও অনেক বেশি।

চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, দেশীয় জাতের আখ চাষে চাঁদপুর জেলার সুনাম ও সুখ্যাতি বহু বছরের। চলতি বছরে জেলায় আখ চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৬৭ হেক্টর আর চাষাবাদ হয়েছে ৬৩৩ হেক্টর, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৬ হেক্টর বেশি। এবছর জেলার মতলব উত্তর উপজেলায় ১৪০ হেক্টর, সদরে ১৫২, মতলবে ১, হাজীগঞ্জে ৮, শাহরাস্তিতে ৩০, কচুয়ায় ৭, হাইমচরে ১০ ও ফরিদগঞ্জে ২৮৫ হেক্টর জমিতে আখ চাষ হয়েছে। ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে আখ কাটা।

চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আ. মান্নান বলেন, চাঁদপুরে সাধারণত দেশীয় প্রজাতির আখ চাষ হয়। এছাড়া ঈশ্বরদী-২৪ এবং নতুন করে রঙ্গবিলাস জাতের আখের চাষাবাদ শুরু হয়েছে। ফলন ভালো হওয়ায় রঙ্গবিলাসের চাষ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে জানান তিনি।

প্রতিবেদন : শারমিন সুলতানা শান্তা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী : বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক পালিত

শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের চাবিকাঠি

শেখ হাসিনার দশ উদ্যোগ, শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ও ভূমি সমস্যার নিষ্পত্তিকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই উন্নয়নের চাবিকাঠি বলে বর্ণনা করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

তথ্যমন্ত্রী ১৬ জুলাই ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আবাদি জমির পরিমাণ কম বিধায় জনসংখ্যার বাড়তি চাপ দেওয়ার সুযোগ নেই। বরং সেখানকার বনাঞ্চলের আধুনিক ব্যবস্থাপনা, উদ্যান তত্ত্বের প্রয়োগ, প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন শিল্প গড়ে তোলাই হবে মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উন্নয়নে পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন ও শান্তিচুক্তির আওতায় ৩৩টি বিভাগ হস্তান্তরের

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৬ জুলাই ২০১৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক-এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন –পিআইডি

উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উ শৈ সিং তাঁর মন্ত্রণালয়ের কাজে সহযোগিতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পার্বত্য ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জিন্নাত ইমতিয়াজ আলী, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামাল উদ্দিন তালুকদার, সাংবাদিক সেলিম সামাদ এবং উন্নয়ন গবেষক গোলাম রসুল অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। **প্রতিবেদন: লিয়াকত হোসেন**

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

দ্বিতীয় ভৈরব রেলসেতু

ভৈরবে মেঘনা নদীর ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে ৯৮২ দশমিক ২ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় রেলসেতু। আইএমইডি'র তথ্য মতে, দ্বিতীয় ভৈরব রেলসেতু নির্মাণে পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। ১৩টি পিলারের মধ্যে আটটি ক্যাপ নির্মাণ শেষ হয়ে গেছে। আর ৬০০ মিটার রিটেইনিং (ধারণকারী) ওয়ালের মধ্যে ৪৮৫ মিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগ রেলপথে আরো ৮টি ছোটো সেতু রয়েছে। এরমধ্যে পাঁচটির পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলোর কাজ চলমান। সব মিলিয়ে প্রকল্পটির ৫৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রেলপথমন্ত্রী মো. মুজিবুল হক—এর বক্তব্য অনুযায়ী আইএমইডি'র সুপারিশে রেলসেতুটি নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোর উন্নয়নে দ্বিতীয় ভৈরব সেতুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থাপনা। তাই এই রুটে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ সেবা সহজ ও দ্রুততর করতে এবং নির্মিত স্থাপনা টেকসই করতে আইএমইডি'র সুপারিশের আলোকে দ্রুত ব্যবস্থা

নেওয়া দরকার।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণের (এলওসি) আওতায় সেতুটি নির্মাণ করছে দেশটির ইরকন-এফকনস জেটি। এজন্য ব্যয় হবে ৫৬৭ কোটি ১৬ লাখ টাকা। তবে চুক্তি অনুযায়ী এ মাসের মধ্যে রেলসেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ করা যাচ্ছে না। কারণ কার্যাদেশ দেওয়ার পর ২৭ মাস পেরিয়ে গেছে। এখনো সেতুটির পিলারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি, তা চলমান। এরপর গার্ডার স্থাপন করা হবে, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এসব কারণে প্রকল্পটির মেয়াদ এরই মধ্যে বাড়ানো হয়েছে। আশা করা যায়, বর্ধিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটির কাজ শেষ হবে এবং জনগণ দ্রুত এর সুফল ভোগ করতে পারবে।

প্রতিবেদন : শিবপদ ম-ল

ইতিহাস ও ঐতিহ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

ইতিহাস-ঐতিহ্যে দিনাজপুরের রামসাগর

রামসাগর শুধু দিনাজপুরের মধ্যেই নয়– বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রাচীন দিঘিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিঘি। শুধু সু-বৃহৎ ও বিস্ময়কর দিঘি হিসেবেই নয় স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ পানির জন্যও এ দিঘি সর্বজনবিদিত। পাড়ের ভূমিসহ এই দিঘির মোট আয়তন ৪,৩৭,৪৯২ বর্গ মিটার। জলভাগের দৈর্ঘ্য ১০৩১ মিটার, প্রস্থ ৩৬৪ মিটার। দিঘির গভীরতা গড়ে প্রায় ৯ মিটার, সর্বোচ্চ পাড়ের উচ্চতা প্রায় ১৩.৫০ মিটার।

দিনাজপুর শহর থেকে ৮ কি.মি. দক্ষিণে আউলিয়াপুর ইউনিয়নে দিনাজপুরের মহারাজাদের অন্যতম কীর্তি এই রামসাগর দিঘি। চারদিকে সবুজ প্রান্তর এবং মাঝখানে পাহাড়ের মতো ধূসর বর্ণের ছোটো ছোটো মাটির টিলার পাড় দ্বারা বেষ্টিত দিঘিটি। মন উদাস হওয়ার মতো গ্রামীণ প্রকৃতির মধ্যে এক খণ্ড লাল গৈরিক

ও স্ফীতিময় টিলার মাটির ওপর এই রামসাগর দিঘি অবস্থিত। অপরূপ মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ভ্রমণবিলাসী ও সকল বয়সের দর্শণার্থীদের আজ পর্যন্ত সমভাবে আকর্ষণ করে চলেছে এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দিঘিটি।

রামসাগর দিঘিকে নিয়ে ছড়িয়ে আছে বহু উপাখ্যান ও উপকথা। প্রাচীন সেচ ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবন, প্রজাদের জলকষ্ট দূরীকরণ এবং তৎকালীন দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের খাদ্যের বিনিময়ে কাজের সংস্থান হিসেবে এই দিঘি খনন করা হয় বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। রামসাগর ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে অব্যবহিত পূর্বে ১৭৫০-৫৫ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুরের রাজবংশের অন্যতম রাজা রামনাথের আমলে খনন করা হয় এবং তার নামানুসারে দিঘিটির নামকরণ করা হয় রামসাগর।

রামসাগর দিঘিটি ৫ বছরে ৫ ভাগে অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত প্রায় ৬১ মিটার (২০০ ফুট) করে চার বছরে (৬১ X ৪)=২৪৪ মিটার (২০০ X ৪=৮০০ ফুট) এবং ৫ম বছরে ১২২ মিটার (৪০০ ফুট) মোট ৩৬৪ মিটার (১২০০ ফুট) খনন করা হয় বলে ইতিহাসবিদরা মনে করেন। দিঘিটি খনন করতে ব্যয় হয়েছিল তৎকালীন মূল্যমানে ৩০,০০০ টাকা এবং বর্তমান মূল্যমানে প্রায় ৫ কোটি টাকা। শ্রমিক সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫ লক্ষ।

রামসাগর দিঘিটি শুধু ঐতিহাসিক স্থান বা কীর্তি নয়, দিঘিটি প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্যের লীলাভূমিও। দিঘির পাড়ের উচ্চ টিলার উপর অবস্থিত সুন্দর মনোরম ডাকবাংলোটি দেশি ও বিদেশি অসংখ্য কৌতূহলী পর্যটকদের নিকট যেমন আকর্ষণীয় স্থান তেমনি ভ্রমণবিলাসী ব্যক্তির নিভৃত অবকাশ যাপনের জন্য নিভৃত নিকেতনও বটে। **প্রতিবেদন : অনিন্দিতা**

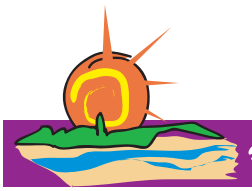

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা ২০১৬

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে একই সাথে অনুষ্ঠিত হলো এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৬। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি সারাদেশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি জোরদার করার মাধ্যমে দেশের সবুজ উন্নয়ন নিশ্চিত করে পরিবেশগত সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জাতি হিসেবে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব সবার। মনে রাখতে হবে, গ্রিন হাউস গ্যাস ইফেক্টের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষায় টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতি গড়ার কোনো বিকল্প নেই। সেই সঙ্গে তিনি বন্যাদুর্গত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।

একনেকে অনুমোদিত হলো পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ প্রকল্প

শেরে বাংলা নগরের পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। ৩৭৪ কোটি ৫১ লাখ টাকার পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর, দিঘি, জলাশয়সমূহ পুনঃখনন ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ আগস্ট ২০১৬ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন ৬টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন —পিআইডি

সংস্কার প্রকল্পটি সহ আরো ৪টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়। একনেকে প্রায় ৯৮৮ কোটি টাকার পাঁচটি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়।

অচিরেই দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাবে : প্রধানমন্ত্রী

শিগ্‌গিরই দেশের ৪৬৫টি উপজেলাকে বিদ্যুতের আওতায় আনা হবে। ইতোমধ্যে দেশের ৭৮ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে। অচিরেই শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ পাবে। ছয়টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতের আওতাসহ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎকে বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশকে শতভাগ বিদ্যুতায়িত করতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। তিনি আরো বলেন, আমাদের এই পদক্ষেপের ফলে দেশের ৭৮ শতাংশ মানুষ এখন বিদ্যুৎ পাচ্ছে। দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা এখন ১৫ হাজার মেগাওয়াট। শতভাগ বিদ্যুতের আওতাভুক্ত ছয়টি উপজেলা হচ্ছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ বন্দর, নরসিংদীর পলাশ, চট্টগ্রামের বোয়ালখালী, কুমিল্লা সদর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট।

প্রতিবেদন : জান্নাত হোসেন

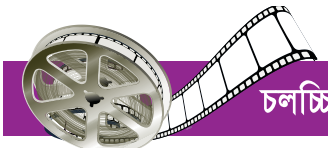

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতসহ চারটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে 'শিকারি'

বাংলাদেশের পর ভারতসহ চারটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে ১২ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে ঢালিউড কিং খান শাকিব অভিনীত 'শিকারি' ছবিটি। মূলত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নেয় ছবিটির প্রযোজনা সংস্থা জাজ মাল্টিমিডিয়া ও এসকে মুভিজ। ভারত ছাড়াও কানাডা, ফ্রান্স ও আমেরিকায় ছবিটি মুক্তি পায়। এ ছবিটি যৌথ ভাবে পরিচালনা করেছেন জয়দেব ও জাকির হোসেন সীমান্ত।

ওপার বাংলায় জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান

পরিচালক অরিন্দম শীল পরিচালিত 'ঈগলের চোখ' চলচ্চিত্রে একেবারে ভিন্নরূপে হাজির হয়েছেন অভিনেত্রী জয়া আহসান। ১২ আগস্ট মুক্তি পায় এ ছবিটি। এছাড়া জয়া পূর্ণদৈর্ঘ্যের পাশাপাশি এ বছর 'ভালোবাসার শহর-সিটি অব লাভ' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। এটিই তার প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। এ চলচ্চিত্রটি মূলত মানুষের জীবনের মানবিক গল্পের ওপর নির্ভর করে নির্মিত হয়েছে।

অভিনেতা তৌকির আহমেদের 'অজ্ঞাতনামা'

জয়যাত্রা (২০০৪), রূপকথার গল্প (২০০৬) ও দারুচিনি দ্বীপ-এর (২০০৭) মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আলাদা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছেন অভিনেতা তৌকির আহমেদ। এবার ক্যারিয়ারের চতুর্থ ছবি 'অজ্ঞাতনামা' মুক্তি পেয়েছে ১৯ আগস্ট। এ ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম ও নিপুণ। আরো আছেন– আবুল হায়াত, ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ শরীফ খান, শতাব্দী ওয়াদুদ, শাহেদ আলী সুজন প্রমুখ। পরিচালনার পাশাপাশি ছবিটির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন তৌকির আহমেদ। মুক্তির আগে অজ্ঞাতনামা কান চলচ্চিত্র উৎসবের বাণিজ্যিক শাখায় অংশ নেয়। এছাড়া ইতালির গালফ অব নেপলস ইন্ডিপেনডেন্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে অর্জন করেছে জুরি মেনশন অ্যাওয়ার্ড।

প্রাচ্য পলাশের PRAKRITA TV চ্যানেল

প্রতিশ্রুতিশীল চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রাচ্য পলাশ একটি ইউটিউব চ্যানেল চালু করেছেন। চ্যানেলটির নাম PRAKRITA TV। এ চ্যানেলে বর্তমানে ১৮টি ভিডিও কনটেন্ট আপলোড করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, ধারাবাহিক ও একক নাটক, টিজার। নির্মাতা প্রাচ্য পলাশ চ্যানেলটি নির্মাণ করেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাঙালি দর্শকদের জন্য। গতানুগতিক সস্তা হাস্যরসপূর্ণ চলচ্চিত্র/ নাটক দেখে দর্শকরা হাঁপিয়ে উঠেছেন, তাদের সেই একঘেয়েমি থেকে এক ধরনের স্বস্তি দেওয়াই নির্মাতার লক্ষ্য। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে নির্মাতা পলাশ বলেন, চলচ্চিত্র হচ্ছে মানবীয় ও সংবেদনশীল মাধ্যম এবং যে-কোনো জাতির সমৃদ্ধিতে এ মাধ্যম অসামান্য অবদান রাখতে কার্যকর।

এ চ্যানেলটিতে ঈদুল আযহা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান দেখা যাবে।

প্রতিবেদন : মিতা খান

সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অষ্টম

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংগঠন নিউ ইকোনোমিকস ফাউন্ডেশনে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে পরিবেশবান্ধব ও সুখী দেশের তালিকায়

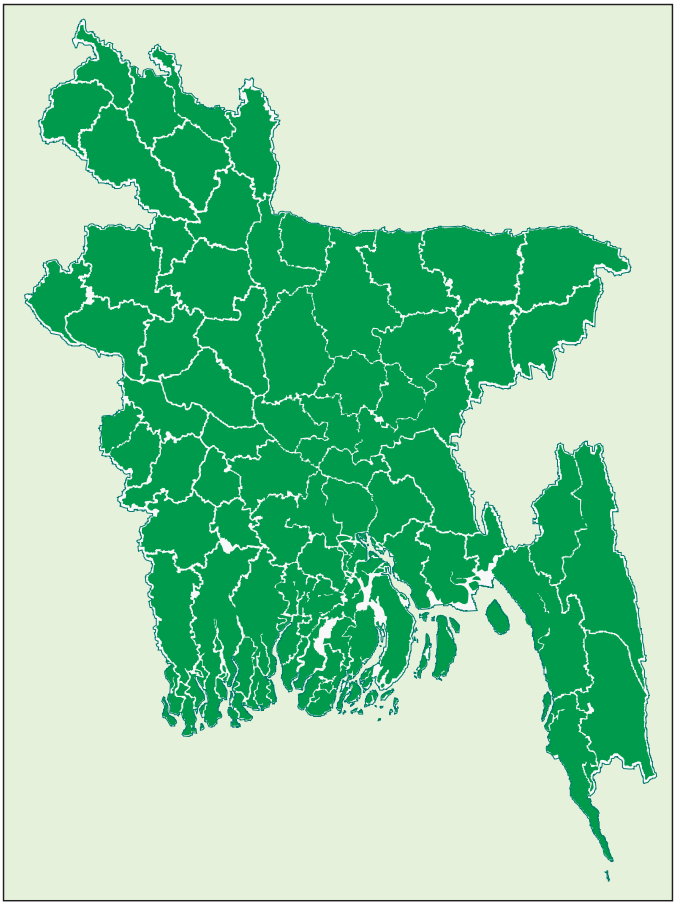

বাংলাদেশ ৮ম স্থানে রয়েছে। ১৪০টি দেশের মধ্যে ৮ম স্থানে থাকা বাংলাদেশের স্কোর ৩৮ দশমিক ৪।

এ তালিকায় সবচেয়ে ভালো স্থানে অর্থাৎ ১ম স্থানে থাকা কোস্টারিকার স্কোর ৪৪ দশমিক ৭। তালিকার সবচেয়ে নীচে অর্থাৎ ১৪০তম স্থানে রয়েছে শাদ।

একটি দেশের নাগরিকদের সন্তুষ্টি, গড় আয়ু, পরিবেশের ওপর প্রভাব ও বৈষম্য– এই চারটি মানদণ্ড বিবেচনায় নিয়ে সুখী দেশের তালিকাটি তৈরি করেছে নিউ ইকোনোমিকস ফাউন্ডেশন। উল্লেখ্য, সন্তুষ্টি ও গড় আয়ু সূচকে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। গড় আয়ুর দিক দিয়ে বাংলাদেশ ৮১তম এবং নাগরিক সন্তুষ্টির বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৫তম। তবে যেসব দেশের মানুষ পরিবেশকে সবচেয়ে কম বদলে দিচ্ছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের স্থান অষ্টম।

নিউ ইকোনোমিকসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশ মানবোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।

সৌদিতে জনশক্তির বাজার খুলেছে

বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে সৌদি আরব। সাত বছর পর সৌদির শ্রম ও সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ১০ আগস্ট এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ, অদক্ষ শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, চিকিৎসক, নার্স, শিক্ষক, কৃষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর সৌদিতে যাওয়ার পথ সুগম হলো। গত জুন মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও সৌদি বাদশাহর মধ্যে আলোচনার সুফল হিসেবেই এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ জানান, 'বাংলাদেশ থেকে রিক্রুটমেন্টের চ্যানেলটি উন্মুক্ত হওয়া আমাদের জন্য একটি বড়ো খবর'। তিনি বলেন, গত বছর নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করার ফলে বাংলাদেশ থেকে সৌদিতে গৃহপরিচারিকা পাঠানো হয়। তিনি আরো বলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে সৌদি আরবে বাংলাদেশি জনশক্তি রফতানির একটি বিশাল বাজার উন্মুক্ত হবে। তিনি বলেন, কোম্পানিগুলো বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়ার জন্য আবেদন করবে। এ সুযোগে যাতে বাংলাদেশের কোনো অসৎ জনশক্তি রফতানি এজেন্সি ঢুকে সৌদি আরবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নস্যাৎ করে দিতে না পারে, সেজন্য কঠোর মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

অভিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণে কলম্বো প্রসেস সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বিদেশে শ্রমিক প্রেরণকারী এশিয়ার ১১টি দেশ অভিবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে আয়োজন করে 'কলম্বো প্রসেস সম্মেলন'।

২৫ আগস্ট শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় আয়োজিত 'কলম্বো প্রসেস'– এর মন্ত্রী পর্যায়ের পঞ্চম সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিবেদন : সাবিনা ইয়াসমিন

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

বর্ণিল সমাপন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পর্দা নামল ৩১তম অলিম্পিক আসরের

বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ক্রীড়া আসর এই অলিম্পিক। ৫ আগস্ট ব্রাজিলের ডিও ভি জেনেই রো'তে বসেছিল এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বিশ্বের ২০৭টি দেশের সাড়ে ১১ হাজার ক্রীড়াবিদ অংশ নিয়েছিলে। ২৮টি অলিম্পিক স্পোর্টস ইভেন্টে পদকের লড়াইয়ে শামিল হয়েছিল তারা। এবারের অলিম্পিক ছিল ৩০৭টি

স্বর্ণপদকসহ মোট ৯৭৫টি পদক ঘিরে। সেই লড়াই শেষে ৪৬টি স্বর্ণসহ মোট ১২১টি পদক জিতে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট জয় করে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় স্থানে গ্রেট ব্রিটেন। ২৭টি স্বর্ণসহ মোট ৬৭টি পদক জিতেছে তারা। এশিয়ার দেশ চীন ২৬টি স্বর্ণসহ মোট ৭০টি পদক জিতে রয়েছে তৃতীয় স্থানে এবং রাশিয়া হয়েছে চতুর্থ।

বাংলাদেশের মোট ৭ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নিয়েছিল রিও অলিম্পিকে।

উদ্‌বোধনীর মতো রিও অলিম্পিকের ২২ আগস্ট ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী ক্রীড়াবিদদের হাসি-আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর ব্রাজিলীয় সংস্কৃতির ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এ অনুষ্ঠান, যার পরতে পরতে ছিল রঙের খেলা। সমাপনী অনুষ্ঠানে পরবর্তী অলিম্পিকের মশাল তুলে দেওয়া হয়েছে জাপানিদের হাতে।

দীর্ঘ বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ

দীর্ঘ বিরতির পরও দেশের মাঠে কিংবা বিদেশে খেলার সুযোগ হয়নি বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের। তবে নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ ক্রিকেটমোদিদের জন্য ২১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে এসেছে আফগান ক্রিকেট দল। তারা বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সাথে তিনটি ওয়ানডে খেলেছে। তিন ম্যাচের এই সিরিজটি অনুষ্ঠিত হয় মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে। এছাড়াও ৩০ সেপ্টেম্বর এসেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। তারা ২টি টেস্ট এবং ৩টি ওয়ানডে খেলেছে।

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ বাছাই-চূড়ান্ত পর্বে বাংলাদেশ

মেয়েদের ফুটবলে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছেই। বিজয়ের পতাকা উড়তে উড়তে এখন সেটা আন্তর্জাতিক ফুটবলের পরিমণ্ডলে গিয়ে ঠাঁই মিলেছে। অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবলের বাছাই পর্বের বাধা টপকে গিয়ে বাংলাদেশের তরুণী ফুটবলাররা এখন চীনে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত পর্বের টিকেট পাকা করেছে। দেশকে নারী ফুটবলাররা উন্নয়নের স্রোতে তুলে দিয়েছে। একটানা ইরান, সিঙ্গাপুর, কিরগিস্তান ও চাইনিজ তাইপেকে অপরাজিত থেকে অনেক গোলের ব্যবধানে হারিয়ে আনন্দে ভাসিয়েছে বাংলাদেশের ফুটবল প্রেমিদের। এমন আনন্দের দিনে ফুটবল মাঠে সাম্প্রতিক সময় আসলে কোথায়।

এবার জয়ের হাতছানি

২০১৫-এর বছরটি স্বপ্নের মতো কাটিয়েছে বাংলাদেশের ক্রিকেট। বিশ্বকাপ কোয়াটার ফাইনালের পর ঘরের মাঠেই হোয়াইট ওয়াশ করেছে পাকিস্তান এবং জিম্বাবুয়েকে। সিরিজ জিতেছে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। মাঠে সাফল্যের ছাপ ফেলে র‍্যাংকিংয়েও এগিয়ে আছে। ক্রিকেট ইতিহাসে ১ম বারের মতো জায়গা করে নেয় সাত নম্বরে। এবারের হাতছানি আরো একধাপ এগিয়ে যাওয়ার। ছয় নম্বর দল হওয়ার জন্য চাই সামনে দুইটি সিরিজের সাফল্য। বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের আর একটি অর্থাৎ আফগানদের হোয়াইট ওয়াশ এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যে-কোনো ব্যবধানে জয়ই নিয়ে যেতে পারে ১ম বারের মতো ওয়ানডে র‍্যাংকিং-এ ছয় নম্বরে। **প্রতিবেদন : জাকির হোসেন চৌধুরী**

নবারুণ

নিয়মিত পড়বে
লেখা ও মতামত পাঠাবে

লেখা সিডি অথবা
ই-মেইলে পাঠান
email : nbdfp@yahoo.com

নবারুণ-এর বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা ।

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন

সচিত্র বাংলাদেশ : dfpsb@yahoo.com ▪ নবারুণ: nbdfp@yahoo.com ▪ বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd. No. Dha-476 Sachitra Bangladesh vol. 37, No. 3 September 2016, Tk. 25.00

প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি সুন্দরবনের চিত্রা হরিণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা